ভালবাসা।

প্রথম সোপান।

শ্রীপ্রাণনাথ প্রেমিকরতন

প্রণীত।

সম্পাদিত।
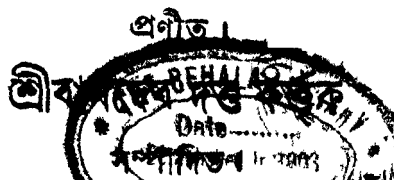
"ভালবাসা সাগরসঙ্গম ; যেথানে বুকে বুকে মাথামাথি,
তাহার মত তীর্থ আর কি আছে ?"

ইতি শ্রীরসিকরঞ্জন।

কলিকাতা

সমুন্নত-সাহিত্যপ্রচারী কোং,

১২৭ নং, মস্‌জীদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীট।
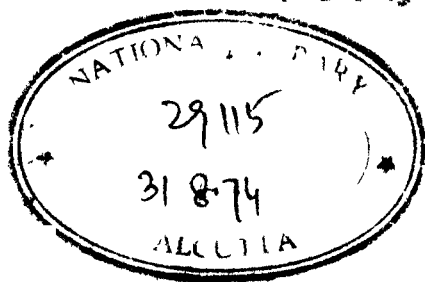
১২৯৭।

ভূমিকা।

প্রাণনাথ আমার পরমাত্মীয়। আমরা উভয়ে একাত্ম বলিলেই হয়। তাঁহার গ্রন্থ সম্পাদনের ভার আমার হাতে। গ্রন্থখানা কিন্তু কোন্ শ্রেণীর, আমি নিজেই বুঝি নাই; অপরকে বুঝাইব কি? ইহা নাটক নয়, নভেল নয়; দর্শন নয়, বিজ্ঞান নয়; ইতিহাস নয়, উপন্যাস নয়; উপকথা নয়, গুপ্তকথা নয়; বিদ্রূপ নয়, ব্যঙ্গ নয়; কাব্য নয়, কবিতা নয়। কোন্ আখ্যায় ইহাকে অভিহিত করা যাইবে, পড়িয়া তাহা স্থির করা যায় না। ঈদৃশ গ্রন্থ প্রচারে কোন প্রয়োজন আছে কি না, সে বিচার পাঠকের হাতে। গ্রন্থকার পাগল। পাঠক গ্রন্থ পড়িলেই তাহা বুঝিবেন; সমালোচক না পড়িয়াই বুঝিবেন। কিমধিকমিতি।

সন ১২৯৭ সাল, জ্যৈষ্ঠ।
জেলা হুগলি,—বৈঁচি।

সম্পাদক
শ্রীবামদেব দত্ত।

ভ্রম সংশোধন।

শুদ্ধিপত্র না থাকিলে বাঙ্গলা গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় না। প্রাণনাথের "ভালবাসা" আমরা অঙ্গহীন করিতে চাহি না। মুদ্রাকরের দোষে ভালবাসায় কতকগুলি ভুল জন্মিয়াছে। মুদ্রাদোষ অনেকেরই থাকে, ভালবাসায় না থাকিবে কেন? ভালবাসার ভুল কিন্তু আমরা ধরিয়া দিব না, পাঠকের মধ্যেও ভালবাসার ভুল যাঁহারা ধরিবেন, তাঁহাদিগকেও আমরা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিব। ভালবাসায় ভুল সর্ব্বত্র সকল কালেই হইয়া থাকে। প্রাণনাথের ভালবাসায় পরিচ্ছেদ-ভুল, সংস্কৃত ভুল, অসংস্কৃত ভুল, ষত্বণত্ব ভুল, হ্রস্বদীর্ঘ ভুল, প্রভৃতি সকল ভুলেরই দুই একটা নমুনা আছে। এবার নমুনা রহিল, গ্রাহক পাঠকের আশয় বুঝিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে যথাবিহিত আয়োজন করা যাইবে।

শ্রীসম্পাদক।

উৎসর্গ পত্র।

নব্য সমাজে নবীন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে যে, গ্রন্থ লিখিলেই তাহা উৎসর্গ করিতে হইবে। শ্রাদ্ধে দানোৎসর্গ বৃষোৎসর্গ উঠিয়া যাইতেছে। বলিদানে ছাগ মেষাদির উৎসর্গে কেহ আর বড় উৎসুক নয়; উদরসাৎ করিবার উপযোগী হইলেই হইল। বিবাহে কন্যা উৎসর্গ করা অসভ্যের রীতি। কন্যা ভবের বাজারে ব্যাপারী ধরিয়া আপনার যৌবন আপনি উৎসর্গ করিবে, ইহাই- আধুনিক শিক্ষাব বিশুদ্ধ নীতি। সাবেক উৎসর্গ-প্রথা তিরোহিত হইয়া হাল আইনে গ্রন্থ উৎসর্গ করার বিধানই বলবৎ হইয়াছে। আমি নবীন গ্রন্থকার, নব্য প্রথার অবমাননা করিতে অবশ্যই নারাজ। কিন্তু আমার এ "ভালবাসা" কাহাকে উৎসর্গ করি? যে আমায় ভালবাসে তাহাকেই ত দিতে হইবে! সে বড় শক্ত কথা। আমি কাহাকে ভালবাসি আমার মন তা জানে; কিন্তু আমায় কে ভালবাসে তাহার খবর সব সময় ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। অতএব, এখন আন্দাজে আন্দাজে, নিরুদ্দেশে, নামের ঘরে শূন্য দিয়া, আমায় উৎসর্গ-মন্ত্র লিখিতে হইতেছে। আমায় বলিতে হইতেছে,—ভাই! ভূতে যদি কেহ আমায় ভালবাসিয়া থাক; ভবিষ্যতে যদি কেহ ভালবাসিবার আশা রাখ; অথবা বর্ত্তমানে যদি কেহ ভালবাসার অনল হৃদয়কুণ্ডে জ্বালাইয়া থাক; তবে তাঁহারই শ্রীচরণকমলে,

কিম্বা কোমল করপল্লবে,—অথবা যদি আরও উর্দ্ধে উঠিতে সাহস দাও ত,—তদীয় কমনীয় কণ্ঠে এই "ভালবাসার" হার পরাইয়া দিলাম। অতঃপর আমি দোষে খালাস। আর কিছু আমি জানি না। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি।

গ্রন্থকার

শ্রীপ্রাণনাথ প্রেমিকরতন।

ভালবাসা।

প্রথম সোপান।

মঙ্গলাচরণ।

পূজার ছুটিতে আমরা পাঁচ ইয়ারে বসিয়া একদিন গালগল্প করিতেছিলাম। তাম্রকূটের শ্রাদ্ধ হইতেছিল। তামাকের গোল-ধোঁয়া, গাল-গল্পের সঙ্গে মিশিয়া, আসর সরগরম করিতে লাগিল। গুড়ুকের "গুরুগম্ভীর" ধূমরাশি, বক্তৃবৃন্দের মুখনিঃসৃত গল্পের ধূমে জড়াজড়ি করিয়া, হরি-হরাত্মার ন্যায় একাত্ম হইয়া শূন্যাভিমুখে সমুত্থিত হইল। দুই জনেরই গতি শূন্য পথে—সেই ফাঁকা গল্পের ফাঁকা ধূম, আর সেই "তৈয়ারি" তামাকের তপ্ত ধূম, এই দুই মিত্রে মাখামাখি করিয়া অনন্ত শূন্যে উড্ডীন হইয়া গগণ-গাত্রে কেমন মিশাইয়া যায়। তখন কাহারই আর চিহ্নমাত্র থাকে না, কাহাকেই আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু, হে তামাকু-দেব! তুমি যেন আমার উপর রাগ করিও না প্রভু। আমি দীন হীন ক্ষুদ্র লেখক, "উদ্বাহুরিব-বামন"বৎ যশঃপ্রার্থী হইয়া, কবিজনসুলভ কল্পনার আবেগে, কেবল উপমার খাতিরে, তোমার সম্বন্ধে একটা তুলনা প্রয়োগ করিয়া ফেলিয়াছি! নহিলে আমি কি জানি না যে তুমি অতুলনীয়? তোমার তুলনা এ জগতে নাই। প্রাণের অন্তস্তল হইতে তোমাকে বিলক্ষণ বলিতে পারা যায়—

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ! এ মহীমণ্ডলে।

নিঠুর ভাষায় যদি না ভুলিতে চাও, তবে হে তামাকু-দেব! হে নেসার গুরু! কবিগুরুর বর্ণনার অনুকরণে তোমার মহিমা বিস্তার করিতে প্রস্তুত আছি। রামায়ণে উক্ত হইয়াছে—

গগণং গগণাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব॥

আকাশ যেমন আকাশেরই মত, অন্য তুলনা তাহার নাই; সাগর যেমন সাগরেরই মত, অন্য তুলনা তাহারও নাই, রাম-রাবণের যুদ্ধ তেমনি রাম-রাবণের যুদ্ধেরই মত, অন্য কোন যুদ্ধের সহিত তাহার তুলনাই হয় না। আমিও তেমনি মুক্তকণ্ঠে বলিব, হে তাম্রকূট! নেসার বাজারে তুমি অতুলনীয়, তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্। আর বঙ্গদর্শনের মতে, নিতান্ত পক্ষে "তুলনায় সমালোচন" যদি করিতে হয়, তবে ইহাই বলিতে পারি যে, বাল্মীকি যেমন কবিকুলমধ্যে আদি-কবি অথবা কবিগুরু; তুমিও তেমনি নেসার মধ্যে নেসার আদি, অথবা নেসার গুরু। নেসার পাঠশালে তুমি ভাই

বেন্দ হাতে-খড়ি! বিদ্যালয়ে মালীর ঘরে, আর পিত্রালয়ে চাকরের গৃহে, সর্ব্বাগ্রে তোমার সেবা করিয়াই ত ধরা পড়িতে হয়! তার পর, বাল্মীকির চেয়ে কালিদাসকে কেহ বড় বলিতে চায় বলুক, তাহারা তোমাকেও তেমনি অনেক নেসার নীচে ফেলিবে জানি। কিন্তু তথাপি বাল্মীকির কবিগুরু নাম যেমন কস্মিন্ কালে ঘুচিবে না, তেমনি আমি বলি তোমারও "নেসার গুরু" নামে কেহ কখনও হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। তোমার আস্বাদ না লইয়া যে অন্য নেসার আশ্রয় লইয়াছে, যে ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাই-য়াছে, যে বর্ণপরিচয় না পড়িয়া বেদান্তপাঠে প্রবৃত্ত হই-য়াছে, তাহাকে আমি "না বেয়াইয়া কানাইয়ের মা" বলি; আর আমার হাতে পাশ-ফেলের ভার থাকিলে, নেসার পরীক্ষায় নিশ্চয়ই তাহাকে নাকোয়াজ করি।

হে তাম্রকূট! তোমার অপার মহিমা, তোমার পায়ে নমস্কার। তুমি বিপন্নের আশ্রয়, তুমি দীন হীনের সম্বল, তুমি বেকারের বল, তুমি হতাশের আশা, তুমি ভিখারীর ভরসা,—ভিখারীর অধম যে চাকর, তাহারও তুমি পরমাত্মীয়। আর যে বিরহী—যাহার কেহ নাই, ইহজগৎ থাকিয়াও যাহার পক্ষে নাই, সেই হতভাগ্য জনের একমাত্র অবলম্বন কেবল তুমি। বিরহীর মুখে অন্ন রোচে না, রাত্রে নিদ্রা হয় না, কোন কাজেই তাহার গা লাগে না, তখন তাহার ভাল লাগে কেবল তোমাকে। তোমার প্রতি তাহার আসক্তি তখন যেন শতগুণে বৃদ্ধি পায়। চিন্তায় মগজ খসিয়া যাইতেছে, বেদনায় বুকে খিল

ধরিয়াছে, কপোলে শতধারা বহিতেছে; আর কিছু ভাল লাগে না—কোকিলকূজনে কুলিশপাত-ভ্রান্তি, চন্দ্রকিরণে শরতের রৌদ্র বলিয়া ভ্রান্তি, ফুলের মালায় সর্পভ্রান্তি, "এ নীল কাপড় হানিছে কামড়"—ইত্যাদি যত প্রকার ভ্রান্তি ও বিরক্তি বিরহাবস্থায় সম্ভব বলিয়া কবিকুলের কাছে পরিচিত;—বিরহীর ভাগ্যে সে সকলই ঘটিয়াছে; তথাপি হে নেসার গুরু! হে দেব! তোমার চিন্তা সে কখন বিস্মৃত হইবে না। তখন বরং কেবলই আন্ তামাক, দে তামাক্; ঢাল্ তামাক্, সাজ্ তামাক্। সুরা প্রভৃতি অন্য মাদকে বিরহীর বিরহ-আগুন দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠে। সুরা জল হইয়াও জ্বালা বাড়ায়; আর তুমি সাক্ষাৎ অনলরূপী, অথচ তুমি তাপ শান্তি কর। তোমার এ অদ্ভুত রহস্যের মর্ম্ম কে বুঝিবে বল?

হে দেব! তুমি আমার প্রতি চিরপ্রসন্ন থাক। অনেক বড় বড় কবি তোমার সেবক হইলেও এরূপ আধ্যাত্মিক স্তবে তোমায় কেহ কখন তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায় নাই; কেবল বাহ্য রূপের বিকাশ বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে মাত্র। প্রভো! এ ভক্তাধীন তোমার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু আর থাক্। কাহার জন্য সে ব্যাখ্যা করিব, কয় জনেই বা বুঝিবে? যে যে পদার্থে তুমি গঠিত, যে যে উপাদানে তোমার অতুলকান্তি বিরচিত, সে সকল পদার্থের নাম শুনিলেও লোকে আমার নামে ঝাঁটা মারিবে। নিকটিনা, গ্লুটেন্; গাম্, লাইম্; আলবুমেন্, আমোনিয়া; সল্ট্ পটাস্, ক্লরোফাইল; ট্যানিক্ আসিড্,

ম্যালিক্ অ্যাসিড্ ইত্যাদি পদার্থের পরিমাণ ও তাহার গুণাগুণ ধরিয়া তোমার বিজ্ঞানতত্ত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রচার করিতে গেলে, শত শশধরের দোহাই দিলেও আমার পার পাইবার পথ থাকিবে না। আর তোমার ধূমপানের যে প্রণালী, সে ত বিজ্ঞানের, বিচিত্র লীলা। কোথায় সেই গুড়্গুড়ীর মাথায় কলিকার আসনে তোমার অধি-ষ্ঠান, আর কোথায় এই সপ্তহস্তপরিমিত নলের মুখে আমার ওষ্ঠাধরপ্রান্ত! এতদূরে, এখান হইতে, আমি টানিতে না টানিতে, কেন বল দেখি, তোমার সদ্যোদ্ভূত ধূমরাশি আসিয়া আমার মুখমণ্ডলের গ্রাস পূর্ণ করিয়া দেয়? আমি টান্ দিবামাত্রই, হুঁকার বা গুড়্গুড়ীর ভিতরকার খানিকটা বায়ু যেমন বহির্গত হইয়া পড়ে; অমনি আকাশের বায়ুভার তোমার দেহভেদ করিয়া, নলিচাপথে, তোমার ধূমরাশি বহন পূর্ব্বক হুঁকার জলে, উহার মলজঞ্জাল ধৌত করিয়া, অমৃতধারার ন্যায় আমার মুখবিবরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। আমার টানে প্রভু! তুমি ত স্থির থাকিতে পার না। যে আকর্ষণে জগৎ অস্থির, সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, আমি যেমন তোমার প্রেমে পাগল, তেমনি তুমিও আমার প্রেমে পাগল হইয়া, ছুটাছুটি আসিয়া আমার মুখামৃতে তোমার অমৃতধারা মিশাইতে থাক। হে তাম্রকূট! হে প্রিয়তম! তুমি আমার প্রিয় সুহৃৎ, এস তোমায় আলিঙ্গন করি।

আর বাড়াবাড়ীতে কাজ নাই। আমার প্রিয় পাঠক হয়ত এতক্ষণে চটিয়া লাল হইয়াছেন। বিশেষতঃ নাটক-পড়া পাঠক ভায়ারা এখনও পাতা উল্টাইতেছেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় করি আমি পাঠিকা-মণ্ডলীকে। যুক্তি তর্কের অবকাশ তাঁহারা দিবেন না, গৌরচন্দ্রিকার গৌরব তাঁহারা বুঝিবেন না, আখ্‌ড়াইয়ের আব্‌দার তাঁহারা সহিবেন না; সদ্য বলিবেন গান ধরিতে। সুর মিলাইতে যদি সময় যায়, তানপুরার কান মলিতে যদি কালক্ষয় হয়, তবে কমলনয়নার কোমল করে কানমলা খাইয়া অনেকেই কুকুররাগিণী ভাঁজিয়া উঠিয়াছেন, এরূপ গুপ্ত সম্বাদ আমি বিস্তর পাইয়াছি। আমার কিন্তু সে ভয় বড় কম, কেন না, আমার কানই নাই,—আমি দুকান-কাটা; নহিলে গ্রন্থকার হইতে যাইব কেন?

তথাপি মানের খাতিরে পাঠিকার চরণে নিবেদন করিতেছি, হে সুন্দরি! ক্ষণমাত্র অপেক্ষা কর; মঙ্গলাচরণ সারিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতে অবসর দাও। যিনি আমার ইষ্টদেবতা, তাঁহারই উপাসনার নাম আমার মঙ্গলাচরণ। আমার প্রণয়িণীও আমার ইষ্টদেবতা বটেন, কিন্তু বরং প্রিয়াবিরহ সহ্য করিতে পারি, তথাপি তাম্রকূটের বিরহ-যন্ত্রণা ক্ষণমাত্র সহ্য হয় না। প্রেয়সী যদি মান করিয়া একদিন কথা বন্দ করেন, তাহাতে আমি ক্ষতিবোধ করি না। কিন্তু তামাকু-দেবীর হুঁকারূপ মুখমণ্ডল আমার মুখচুম্বন করিয়া যদি মানভরে বলেন, "আমি সাড়া শব্দ দিব না, আমি কথা কহিব না, আমি ডাকিব না," তবে যতক্ষণ সে মানভঞ্জন করিতে না পারি, ততক্ষণ আমি যেন মরণাধিক যন্ত্রণা পাই। একবার রেলপথে আমার হুঁকা বুজিয়া গেলে, একজন ষ্টেসন-মাষ্টার আমার কাতরতা দেখিয়া

একটি ছিঁচ্‌কে দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ধন্যবাদ আমি কাগজে ছাপিতে দিয়াছিলাম; সম্পাদকের ধৃষ্টতায় সে মর্ম্মান্তিক কৃতজ্ঞতা ছাপা হয় নাই!

তামাকু বড় সহজ সামগ্রী নয়। আমি জানি কোন নববিবাহিত যুবক, শ্বশুরালয়ে তামাকুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, নবপ্রণয়িনীকে বিষাদসাগরে ভাসাইয়া, না বলিয়া গোপনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাম্রকূট বড় সহজ দেবতা নয়। সীতাদেবীর জন্য লঙ্কাযুদ্ধ হইয়াছিল, হেলেনার জন্য ট্রয়ের সমর বাধিয়াছিল, আর তামাকু-সুন্দরী কি কখনও কোন বিগ্রহের কারণীভূতা হন নাই? সে সংবাদ আমি রাখি। আমার এক বন্ধু আছেন; তিনিও আমারই মত তামাকুসেবক, নহিলে আমি বন্ধু বলিব কেন? তাঁহাতে আমাতে একদিন বাজী রাখিয়া তামাকু খাইয়াছিলাম;—দুই জনে দুই হুঁকায়। নহিলে, এক হুঁকার প্রত্যাশায় একে অপরের মুখ তাকাইয়া থাকিলে, তখনি একটা গজকচ্ছপী বাধিয়া যাইত। এরূপ যুদ্ধ ত পৃথিবীতে নিত্যই সংঘটন হইতেছে। কৃত্তিবাস কথায় কথায় বলিয়াছেন,—

দুই মত্ত হস্তী যেন হস্তিনী কারণ।

এখন আমার সেই বন্ধুর কথা বলি। আমার সহিত তাঁহার লড়াই বাধে নাই বটে; কিন্তু আর একজন অর্ব্বাচীন তামাকু খাইতে খাইতে তাঁহাকে হুঁকা দিতে বিলম্ব করায়, আমার সেই বন্ধুবর ক্রোধে অধীর হইয়া বিয়াল্লী সিক্কার ওজনে একটি চপেটাঘাতে তাঁহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। উপন্যাস নয়, সত্য কথা;

তোমরা কেহ না মান, আমি সেই বন্ধুকে সাক্ষী মানিব। শপথ করিয়া গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তিনি সত্য কথা প্রকাশ করিবেন।

রাগের মাথায়, অধীরা পাঠিকা সুন্দরীকে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া, এখন আবার দেখিতেছি, দ্বিতীয় কৈফিয়তের দায়ে পড়িলাম। সমালোচক ভায়া ধরিয়া বসিবেন, "গ্রন্থ-কার বড় অসাবধান, তামাকুর লিঙ্গ স্থির রাখিতে পারি-লেন না। গোড়ায় পুংভাবে তাম্রকূটের পরিচয় দিয়া, এখন আবার স্ত্রীলিঙ্গবৎ ব্যবহার করিতেছেন। যিনি আগে ছিলেন দেব, তিনি এখন হইলেন দেবী; যিনি ছিলেন প্রভু, তিনি হইলেন সুন্দরী।" এতদুত্তরে আমার কৈফিয়ৎ এই যে, তামাকু আমার পক্ষে পরব্রহ্ম স্বরূপ, সুতরাং নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও লিঙ্গহীন। আমি ভক্ত, যখন যেমন চাই, তখনই সেই ভাবে তাঁহার বর্ণনা করিতে পারি। তা ছাড়া ব্যাকরণ আমার হাতে। অলঙ্কারের ধার আমি ধারি না, সে সকলই "কলত্রায় অর্পণমস্তু" করিয়া বসিয়াছি। আর ভাষা আমার আজ্ঞা-ধীনা; সুতরাং কাকে কি বলি না বলি,—আমি গ্রন্থ-কার, সে অধিকার আমার যেমন আছে, এমন আর কাহারও নাই। আমার এখন অবারিত দ্বার, অনন্ত অধি-কার। অতএব তোমরা সব, আর গোল করিও না, আমি গ্রন্থারম্ভ করি। কৈফিয়তের শাসানীতেই আমার প্রাণটা গেল। কৈফিয়তের ভয়েই আমি চাকরীতে নারাজ। এখন দেখিতেছি, যেখানেই যাই, কৈফিয়তের হাতে

কোথাও নিস্তার নাই। এই যে ভবসংসার, এই যে প্রকাণ্ড কর্ম্মস্থল, এখানকার সব কৈফিয়ৎ সেখানে গিয়া আনুপূর্ব্বিক দিতে হইবে। কড়া গণ্ডা, পাই ক্রান্তি সব বুঝিয়া লইবে; কিছুই ছাড়িবে না।

অতএব আমার গৌরচন্দ্রিকার শেষ কৈফিয়ৎ আপনা হইতে দিয়া রাখি। ভালবাসার উপক্রমণিকায় তামাকের উপর এত ঝোঁক্ দেখিয়া তোমরা কেহ অপ্রাসঙ্গিক মনে করিও না। ধোঁয়া-যাত্রা যাত্রা ভাল, এটা ত সোজা কথা, সবাই জানে। সুতরাং সাহিত্যবাজারে আমার এই গঙ্গাযাত্রার পক্ষে এটা এক প্রকার নিশ্চয়ই আবশ্যক বলিয়া তোমরা অবশ্যই ধরিয়া লইবে। দ্বিতীয় কথা, তামাকের সঙ্গে এই যে আমার ভালবাসা, ভালবাসার রাজ্যে ইহা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরং ইহা একপ্রকার উচ্চ শ্রেণীর ভালবাসা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। অন্য ভালবাসায় বিচ্ছেদ আছে ব্যাঘাত আছে, লাঞ্ছনা আছে যন্ত্রণা আছে, গলা-ধাক্কা আছে দক্ষিণান্ত আছে। কিন্তু এ ভালবাসা অটুট অক্ষয়, চিরনির্ম্মল চিরস্থির; ইহা এক প্রকার সঙ্গের সাথী বলিলেই হয়। ইহাতে কলহ নাই কলঙ্ক নাই, হিংসা নাই আক্রোশ নাই; ইহা চিরপবিত্র। অতএব এমন ভালবাসার চরণে আগে মাথা না নোয়াইয়া, তুমি কি মনে কর সুন্দরি! তোমার কাব্যগত ভালবাসার সমালোচনে হস্তক্ষেপ করিতে পারি?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

তামাকের সঙ্গে আমাদের গাল-গল্পের স্রোত অবিশ্রান্ত চলিয়াছে, এমন সময় সোপানমার্গে একটা খটাখট্ শব্দ হইল। কাষ্ঠ-পাদুকার সংঘর্ষে শাণের উপর যেমন শব্দ হয়, এ শব্দ ঠিক তদনুরূপ বলিয়াই অনুমিত হইল। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অধিকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না। দেখা গেল বাস্তবিক খড়ম্-পায়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া সহসা সম্মুখে সমুপস্থিত। সন্ন্যাসী খড়মে সিদ্ধহস্ত—শ্রীবিষ্ণু! সিদ্ধপাদ বটেন। নহিলে খড়ম্-পায়ে অবলীলাক্রমে সোপানলঙ্ঘন, যে-সে পায়ের কাজ নয়। খড়মে সিদ্ধ দেখিয়াই আমরা সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বসিতে বলিলাম, অন্য রূপ সিদ্ধি অসিদ্ধির কথা তখন আর কে বিচার করে'বল?

আসন গ্রহণ করিলে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের আপাদমস্তক আমরা সমালোচকের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম; কিন্তু স্পষ্টই বোধ হয়, যেন অধুনা সে কান্তি কিছু ক্লিষ্ট, কিছু মলিন, রৌদ্রাতপে যেন কিঞ্চিৎ বিশীর্ণ। মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব মাধুরীময়, প্রতিভার জ্যোতি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু সে ফুটন্ত জ্যোতির ভিতরেও যেন একটু মলিনতার ছায়া, একটু

অাঁধার-মাখা আলো, ঠাকুর-বাড়ীর "ঘুমন্ত জোছনার" মত এক একবার চমক মারিতেছে, কিছুতেই ঢাকা থাকিতেছে না। সন্ন্যাসী স্বভাবতঃ হাস্যময় ও মধুরভাষী। অথচ কে জানে কেন সেই হাসিমাখা-মুখে, তরল-মেঘের চঞ্চল ছায়াপাতের মত, বিষাদের ক্ষণিক ছায়া আপনার কায়া বিস্তার করিয়া, পরক্ষণেই আবার অদৃশ্য হইতেছে। সন্ন্যাসী বাচাল নহেন, অথচ সদালাপী বটেন; বোধ হয় যেন কথাবার্ত্তার জন্য কিছু ব্যগ্র। কিন্তু তথাপি কথা কহিতে কহিতে সহসা গাম্ভীর্য্য আসিয়া এক একবার যেন তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরে। যেন তিনি কথা কহিতে চাহিলেও কে আসিয়া বাধা দেয়। মুখভঙ্গী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, বিলক্ষণ বুঝা যায় যে ভিতরে একটা কোন বিষম রহস্য অবশ্যই বুঝি আছে।

সন্ন্যাসীর বেশ ভূষা কিছু বিচিত্র রকমের বটে। বিচিত্র হউক, কিন্তু নূতন নয়। তাঁহার পরিধান গেরুয়া-বসন, গায়ে জানু-পর্য্যন্ত-বিলম্বী এক চোগা বা আল্‌খেল্লা, তাহাও গেরুয়া রঙ্গে ছোপান। মস্তক অনাবৃত, স্পষ্টই বুঝা গেল, জাতিতে ইনি বাঙ্গালী। মাথায় জটা নাই, ভ্রমরকৃষ্ণ দিব্য-কুঞ্চিত-সুচারু-চিকুরভার অনাদরে ইতস্ততঃ এলাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই অনাদরবিন্যাসের ভিতরেও যেন একটু পারিপাট্য আছে। যাত্রা-থিয়েটরের মুনি ঋষির মাথার মত, এ মাথার কেশরাশি কিস্তুত-কিমাকার ভাবে দোদুল্যমান অথবা উড্ডীয়মান নহে। মাথার চুল এক গাছিও পাকে নাই, পাকিবার বয়সও হয় নাই।

সন্ন্যাসীর বয়স বোধ হয় ত্রিশ পার হইয়াছে। ত্রিশ পার হইলেই প্রবীণ হয় কি না তা জানি না। কিন্তু সংসারভোগের একটা অতৃপ্তি-চিহ্ন, বৈরাগ্যের সঙ্গে সমাগত হইয়া সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গে যেন দ্বন্দ্ব করিয়া বেড়াইতেছে।

কথাবার্ত্তায় জানিলাম, সন্ন্যাসী স্বেচ্ছাবশে সংসার ত্যাগ করিয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। অনেক দেখিয়া শুনিয়া অনেক বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা কেবল ভ্রমণজন্য নহে; পড়া শুনা যথেষ্ট আছে। আলাপে বুঝিলাম, অনেক শাস্ত্রেই তিনি সুপণ্ডিত। তিন বৎসর কাল তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। কেন ত্যাগ করিয়াছেন, কোথায় তাঁহার সংসার ছিল, আর সংসারে এখন আছেই বা কে, এ সকল কথা আমরা একটু জেদ্ করিলেও তিনি প্রকাশ করিলেন না; করযোড়ে জানাইলেন, "আপনারা আমায় ঐ বিষয়ে ক্ষমা করিবেন, পরিচয় জন্য কোন রূপ প্রশ্ন করিবেন না।" শাস্ত্রীয় কোন তর্ক উঠিলে সন্ন্যাসী ঠাকুরের মুখকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সাগ্রহে ও পরম সমাদরে তিনি বিবিধ শাস্ত্র হইতে বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অবলীলাক্রমে কুটিল তর্কের সুন্দর মীমাংসা করিয়া দেন। কিন্তু সংসার-ভোগের কোন কথা লইয়া আলোচনা হইলে সন্ন্যাসীর মুখে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হয়; কিছু অন্যমনা হইয়া, ঈষচ্চঞ্চল চিত্তে, ঈষদিতস্ততঃ করিয়া, অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যবলে সকলকে মুগ্ধ করিয়া, পূর্ব্বকথা

ভুলাইয়া দেন। সন্ন্যাসী কেবল সুপণ্ডিত নহেন, তিনি সুবক্তা। তাঁহার বচন-বিন্যাস-প্রণালীতে এমনি একটু মধুরতা, এমনি একটু মাদকতা আছে যে তিনি কথা কহিলেই সভামণ্ডল আপনা আপনি নিস্তব্ধ হয়, কাণ পাতিয়া সকল কথাগুলি শুনিবার জন্ত সকলেরই চিত্ত ব্যাকুল হয়। অধিক কি, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে দুই একবার আমার তামাক টানা বন্দ হইয়াছিল, মুখের নল অলক্ষ্যে মুখ হইতে পড়িয়া গেল, আমি চমকিয়া উঠিয়া ছিলাম। সন্ন্যাসীর সহিত কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে একটু অবসর পাইয়া, আমাদের সভার এক রত্ন তামাকের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, চক্ষু বুজিয়া গুণগুণ রবে একবার একটি গান ধরিলেন—

জানি না যে কেন ভালবাসি।
যতনে যাতনা বাড়ে তবু মন অভিলাষী॥
বাসে বা না বাসে ভাল, ভাল বেসে থাকি ভাল,
কি ফলে বিফল আশা, বাসনা সলিলে ভাসি॥

গানটি গুণগুণ করিয়া ধরিবামাত্র সন্ন্যাসী চক্ষু কর্ণ স্থির করিয়া কথা বন্দ করিলেন, এবং সাগ্রহে অনুরোধ করিলেন, "মহাশয় বোধ হইতেছে আপনি সুগায়ক, গলা ছাড়িয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক গানটি শুনাইবেন কি?" সে গায়ক সুগায়ক কি না বলিতে পারি না। কিন্তু একটা গুণ তাঁহার আছে যে কেহ গাইতে বলিলে তাঁহার কর্ণমাত্র আপত্তি নাই, গাইবার জন্য তিনি সদাই যেন হাত ধুইয়া বসিয়া আছেন। অতএব তিনি যে সুগায়ক নহেন, ইহাই তৎপক্ষে একটা উৎকৃষ্ট

প্রমাণ। অনেক আরাধনায় নহিলে সুগায়কের গান গাইতে নাই, সঙ্গীত জগতের এক প্রকার ইহা বাঁধা নিয়ম। গানের বিষয়ে আমাদের প্রোক্ত বন্ধু কিন্তু মুক্তহস্ত, অথবা শুদ্ধ করিয়া বলিতে গেলে মুক্তকণ্ঠ। কি পাকশালায়, কি শৌচাগারে, তাঁহার সঙ্গীতের গুণগুণানি তুমি সর্ব্বত্র শুনিতে পাইবে। শয়নাগারে নবগৃহিণী লজ্জাবশতঃ কতবার তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরায় তিনি হুঁকা-হাতে ছাতে গিয়া, ঠোঁটের আগায় যে গান আসিয়াছিল, তাহা ঝাড়িয়া দিয়া পেট-ফাঁপা নিবারণ করিয়াছেন, এ গল্প অনেক বার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহার পেট যেন ফুলিতেছিল; অনুরুদ্ধ হইবামাত্র নাকে মুখে অম্মাকের সুখটান মারিয়া হুঁকা ফেলিয়া তিনি গান খানা বাগাইয়া ধরিলেন। বাঘে যেমন ছাগল ধরে, ওয়ারেন্টের পেয়াদা যেমন আসামীকে ধরে তেমনি সবলে তিনি গান খানাকে ধরিয়া, তাঁহার যত কিছু কর্তপ কায়দা, গিট্‌কিরি গমক্, সকলই খাটাইয়া, প্রাণপণে প্রাণ ভরিয়া গানটি গাহিয়া শেষ করিলেন। তিনি সুগায়ক অর্থাৎ ওস্তাদী গায়ক না হইলেও, সুকণ্ঠ বটেন। শিশুর অস্ফুট ভাষার ন্যায়, প্রণয়িনীর তিরস্কারবাণীর ন্যায়, কি এক অপূর্ব্ব মাধুরী তাঁহার কণ্ঠস্বরে মাখান আছে; শুনিলে মুগ্ধ না হয় এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না।

যতক্ষণ গান হইতেছিল, আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সন্ন্যাসী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাণ পাতিয়া কর্ণপথে যেন সুধাপান করিতেছিলেন। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমতঃ গায়ককে ধন্য ধন্য

করিতে লাগিলেন। পরে সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে, সঙ্গীত বিষয়ক বিবিধ তত্ত্ব সকল প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার সঙ্গীত-রসজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন। সঙ্গীতে তিনি নিজে নিপুণ নহেন, কিন্তু সঙ্গীতরসে তাঁহার বিলক্ষণ আসক্তি দেখিলাম। আমাদের বন্ধু রসিকরঞ্জন এই সময় টপ্পার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর বাধা দিয়া বলিলেন, টপ্পাই যে গানের রাজা, এমন কথা আমি বলি না। টপ্পাই হউক আর যাই হউক, গানের সুরের দিকেই অগ্রে লক্ষ্য করিতে হইবে। খাম্বাজ বড় মিঠে রাগিণী। যাহা কিছু মধুর তাহাই ত মনস্তৃপ্তিকর। সন্ন্যাসীর এ কথায় আমার কিন্তু তৃপ্তি হইল না। সঙ্গীতের ভাষার যে মোহকারিতা থাকে না, একথা আমি মানি না। ভাষার সৌন্দর্য্যে, সুরের সাহায্য করে, ভাষায় কবিত্ব না থাকিলে সঙ্গীতের রসহানি হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ইহার বিপরীত কোন কথা সন্ন্যাসী বলেন নাই বটে, আর সে তর্ক তুলিবারও অবকাশ আমি পাইলাম না। বেলা এক প্রহরের সময় আমাদের সন্ন্যাসীসমাগম হইয়াছিল; খাম্বাজ সে সময়ের রাগিণী নয় বলিয়া, সন্ন্যাসী মহাশয় এই বার গায়ককে একটি সময়োচিত গান করিতে নিতান্ত অনুরোধ করিলেন। গায়ক গিরীশ ভায়া গুণগুণ রবে টৌড়ি ভৈরবীর আলাপচারী করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আমি মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলাম, টপ্পাটী যে গাওয়া হইল, তাহার ভাষার দিকে সন্ন্যাসীর লক্ষ্য একেবারেই কি ছিল না? গানের কোন কথায় সন্ন্যাসীর গায়ে কিছু আঁচড় লাগিয়াছে কি?

গানের গাঁথুনীতে সন্ন্যাসীর হৃদ্‌যন্ত্রস্থ কোন তারে আঘাত লাগিয়াছে কি? কিন্তু আর ভাবিবার সময় পাইলাম না। তখনি গগণভেদ করিয়া, শ্রোতৃবৃন্দের শরীর কণ্টকিত করিয়া, টৌড়ী-ভৈরবীতে গায়কের তান ছুটিল—

শ্যাম হে কেন তোমার হেরি যোগীবেশ।
স্বরূপ কহনা কেন ওহে হৃষীকেশ॥
ত্যজি অগুরু চন্দন, বিভূতি অঙ্গে লেপন,
রুণ্ডমালা বিভূষণ, নীলকণ্ঠে শেষ।
ত্রিশূল ডম্বরু করে, ফণী বিভূষিত শিরে,
সুরধুনী ধ্বনি করে, জটাবদ্ধ কেশ॥
অনুভবে বুঝা গেছে, মান হেন সাজায়েছে,
সকলি গিয়াছে, কেবল আছে বাঁকা নয়ন বিশেষ॥

সঙ্গীতের মোহকারিতা সকলেই ত স্বীকার করে। কিন্তু তথাপ সে দিন সেই সন্ন্যাসীর ভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে দেখিলাম তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা ছুটিয়াছে। বিস্মিত চিত্তে ভাবিলাম, একি ভক্তি? না সঙ্গীতের কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তি? অথবা অন্য কোন অন্তর্লীন গূঢ় শক্তি সঞ্চারিত হইয়া সন্ন্যাসীর চিত্তে ঈদৃশ ভাবান্তর উপস্থিত করিয়াছে? মনে মনে এইরূপ তর্ক করিতেছি, এমন সময়, সন্ন্যাসী যেন ঈষদপ্রতিভ হইয়া, শশব্যস্তে নয়নের জল মুছিয়া, জয়দেবের মধুর পদে মধুসূদনের নামোচ্চারণ করিলেন—

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল।

কলিত ললিত বনমাল।

জয় জয় দেব হরে।

আমাদের বন্ধু রসিকরঞ্জন ত্রিগুণময় বলিলেই হয়। তিনি যেমন রসিক, তেমনি চতুর, আবার তেমনি মুখর। সন্ন্যাসী প্রকৃতিস্থ হইবমাত্র তিনি প্রস্তাব করিলেন "সঙ্গীত পদার্থটা বড় তীক্ষ্ণধার, সকলের শরীরে উহা সহ্য হয় না। যে গণ্ডারচর্ম্মী, সঙ্গীতের আঘাত সেই সহ্য করিতে পারে। সন্ন্যাসীর কোমল প্রাণে সঙ্গীতের শাণিতাস্ত্র সহ্য হইবে কেন? সে আঘাতে সন্ন্যাসীর শোণিতাশ্রু ছুটিবে ইহা আর বিচিত্র কি? অতএব সঙ্গীতে আর সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কষ্ট না দিয়া অন্য কান প্রসঙ্গে তাঁহার সঙ্গসুখ উপভোগ করা আমাদের সুবিধেয়।"

সাধু সাধু বলিয়া সভ্যমণ্ডলী এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। স্বয়ং সন্ন্যাসীও রহস্যে রাগ করিলেন না; রাগ করিয়া ধরা দিবার পাত্র তিনি নহেন। রহস্যে রং মিশাইয়া তিনি বরং আসর আরও গরম করিয়া তুলিলেন। তখন কি করা উচিত এই তর্ক উঠিলে, তর্কচূড়ামণি ব্রজরাজ বলিলেন, "বাজে গোল না করিয়া, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে একটা বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা হউক। বক্তৃতা অনেক কাল শুনা হয় নাই, এমন সুযোগও আর সহজে হইবে না; আর ইহাঁর মত এমন সুপণ্ডিতের বক্তৃতা অবশ্যই সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ হইবে।"

বক্তৃতার নাম শুনিবামাত্র সকলেই সানন্দে করতালি দিয়া উঠিলেন; বক্তৃতার বিষয়ান্বেষণ হইতে লাগিল। অতঃপর রসিকরঞ্জন যে প্রস্তাব করিলেন, তাহাতে আর কাহারই কথা কহিবার পথ রহিল না। তিনি বলিলেন, "বক্তৃতা ভাল বিষয়ের হওয়াই ভাল। 'ভালবাসাই' জগতের ভাল জিনিস। অতএব সন্ন্যাসী মহাশয় 'ভালবাসার' বক্তৃতা করিয়া, আমাদের ভালবাসা বর্দ্ধিত করুন। সন্ন্যাসী এতক্ষণ নীরব ছিলেন, এইবার কথা কহিলেন, বলিলেন, সন্ন্যাসীর মুখে ভালবাসার বক্তৃতা, মরুভূমে জলাশয়ের প্রত্যাশার ন্যায় আপনাদের অসঙ্গত কামনা হইতেছে না কি? কিন্তু রসিকরঞ্জনের মুখের তোড়ে সন্ন্যাসীকে হার মানিতে হইল। তিনি বলিলেন, হইলেনই বা আপনি সন্ন্যাসী, আপনি ত জগতছাড়া নন্, জগৎ ভালবাসায় বাঁধা আছে। আর আপনি যদি ভালবাসার শত্রু হন, শত্রু পক্ষের কথাই আমরা শুনিব। ভালবাসার ভাল কথা ত অনেক শুনা গিয়াছে, মন্দ কথা না হয় আপনি বলুন, সে ও ভাল। ভালবাসা আপনি বধ করুন, বলি দিউন, জবাই করুন, আপনার মুখে ভালবাসার বক্তৃতা না শুনিয়া আমর ছাড়িব না।

অবশেষে স্থির হইল, বক্তৃতা সন্ন্যাসী কেবল একা করিবেন না, আরও পাঁচজনে "ভালবাসা" বিষয়ে সাধ্যমত আপন আপন মত প্রকাশ করিবেন, সন্ন্যাসীও সেই সঙ্গে তদুপলক্ষে একটী স্বতন্ত্র বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতা, রীতিমত সভা করিয়া, আহারান্তে আরম্ভ হইবে। স্নানাহার জন্

সকলে প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসীও স্নানাহ্নিক-সমাপনান্তে স্বহস্তে পাক করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিলেন। স্নান-কালে দেখা গেল, তাঁহার গলদেশে যজ্ঞসূত্র রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে আমার বাটীর পূজার দালানে সভার অধিবেশন হইল। বাটীতে স্কুল বসিত। স্কুল এখন বন্দ। স্কুলের চেয়ার টেবিল বেঞ্চ প্রভৃতি উপকরণে সভার আসর নির্ম্মাণে কোন কষ্টই হইল না। টেবিলের উপর দুই গেলাস জল ও চারিটা লেমনেড্ বক্তৃবৃন্দের তৃষ্ণা নিবারণ জন্ম যথারীতি স্থাপিত হইল। বন্ধু রসিকরঞ্জন সেই সঙ্গে সের কয়েক রসগোল্লা রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু নজীর নাই বলিয়া, এবং মিষ্টান্নের রসে পাছে বক্তৃবৃন্দের মুখ মারিয়া দেয়, এই ভয়ে সে প্রস্তাব আপাততঃ অগ্রাহ্য হইল। সভার ঘণ্টা বাজিলে, নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত, অনাহূত রবাহূত, কত সভ্য অসভ্য, অর্দ্ধ সভ্য সিকি সভ্য, পূর্ণ সভ্য পনর-আনা-সভ্য, দলে দলে আসিয়া সভাস্থলে দেখা দিলেন। কাহাঁরও কোট কাহারও কামিজ, কাহারও শুধু চাদর কাহারও সুধু জামা, কাহারও চাপকান্ কাহারও চোগা, এইরূপ বহুরূপীর সাজে পাড়াগাঁয়ের সভা শোভান্বিত হইল। সভার অভাব কিছুই রহিল না; তবে ভগিনীজাতীয়া কোন সভ্যা খোঁপার কোলে গোলাপ ফুল গুঁজিয়া সভার শোভা সম্বর্দ্ধন না করিলে বর্ত্তমান সভা, বিশেষতঃ ভালবাসার সভা অঙ্গহীনা হয় কি না, এই কথা লইয়া দুই একজনকে কাণাঘুষা করিতে আমি শুনিয়াছিলাম। সেরূপ

স্ত্রিনীর অভাব পাড়াগাঁয়ে এখনও পূর্ণমাত্রায় আছে। তবে অত্র ক্ষেত্রে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমার শ্যালকের ভগিনী মহাশয়া, দালানের পাশে একটী অন্দরের কক্ষে খড়খড়ীর ফাঁকে কাণ পাতিয়া খাড়া ছিলেন। গ্রন্থমধ্যে এ সম্বাদ সন্নিবেশিত করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি নিজে বিশ্বাস করি না। কিন্তু পাছে কোন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক, গোয়েন্দার দ্বারা এ সংবাদ অবগত হইয়া, সত্যের অপলাপ দোষে আমায় অপরাধী করিয়া বসেন, এই ভয়ে অগত্যা উক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

সভায় সকলই প্রস্তুত, কেবল এক প্রতীক্ষা বন্ধু ব্রজরাজ এখনও দেখা দেন নাই। তাঁহার গতিকই ঐরূপ। সহজেই স্নান করিতে তাঁহার পাকা দেড় ঘণ্টা সময় যায়। তাহাতে আজ হয় ত তিনি স্নানের ঘাটে বক্তৃতার সুর ভাঁজিতেছেন, এই আশঙ্কায় আর অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করা উচিত বলিয়া স্থির করা গেল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে, বন্ধুবর কোঁচা দোলাইয়া কোমর পর্য্যন্ত কোর্ত্তা-গায়ে, কোমরে চাদর বাঁধিয়া, ভুঁড়ী ফুলাইয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া সহাস্যে সমুপস্থিত। সভার সমাগম সম্পূর্ণ হইলে, এবার সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উঠিল। সভা আমার বাটীতে বসিয়াছে বলিয়াই হউক, অথবা আমার গোঁপজোড়াটা জাঁকাল দেখিয়াই হউক, সভাপতির আসনে আমাকেই বসাইবার কথা উত্থিত ও স্থিরীকৃত হইয়া গেল। আমিও পেটে-ক্ষুধা মুখে-লাজ-গোছের যথারীতি বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক, এক

লক্ষে গিয়া সভাপতির আসন অধিকার করিলাম; এবং অবিলম্বে সভার কার্য্যারম্ভ জন্য সমুত্থিত হইয়া বলিলাম ;—

"সভ্যগণ! বন্ধুগণ! সভাপতি পদের আমি নিতান্ত অযোগ্য পাত্র। ভালবাসার সভা, আমি সভার যোগ্য নয়, ভালবাসার যোগ্যও নয়। তবে যে আপনারা নিজগুণে আমায় ভালবাসিয়া সভাপতির সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন, সে জন্য অগণ্য ধন্যবাদ না দিয়া আমি থাকিতে পারি না। এক্ষণে আর কালবিলম্ব না করিয়া কার্য্যারম্ভ করা হউক। আমাদের বন্ধু ব্রজরাজ বড় বিলম্বে আসিয়াছেন, বড়ই ভোগাইয়াছেন, অতএব দণ্ড স্বরূপ তাঁহাকেই আমি মুখপাৎ হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করি।"

ব্রজরাজ তখন থামের আড়ালে তামাক টানিতেছিলেন শুনিবামাত্র হুঁকা ছাড়িয়া, সভাস্থলে গুড়ুকের ধোঁয়া উড়াইয়া দিয়া, তাল ঠুকিয়া বক্তৃতা ধরিলেন—

শুন ভাই সকল।"

ভালবাসা এক মহাযজ্ঞ। যেমন অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ প্রভৃতি মহা মহা যজ্ঞের মহিমা বেদ পুরাণে বর্ণিত আছে, তেমনি ভালবাসা রূপ মহাযজ্ঞের মহিমা আমি অদ্য এই সভাস্থলে মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিব। ভালবাসা সত্য সত্যই মহাযজ্ঞ বটে। প্রণয়প্রার্থী পুরুষ ইহার যজমান। কেশরাশি এ যজ্ঞের কুশকাশ। হস্ত পদাদি ইহার সমিধ কাষ্ঠ, মনের আগুন ইহার হোমানল, ঘটক ইহার পুরোহিত। যথা সর্ব্বস্ব এ যজ্ঞে আহুতি দিতে হয়, জীবনসর্ব্বস্ব ইহার দক্ষিণা। ভালবাসার যজ্ঞে স্বয়ং যজমানই অশ্বমেধের ঘোটক। অপ-

মেধ যজ্ঞে ঘোটকের শিরে জয়পতাকা বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই ঘোটক দিগ্বিজয়ী হইয়া ফেরত আসিলে, তাহাকে হনন পূর্ব্বক, যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভালবাসার যজ্ঞেও ঠিক তাই হয়। অশ্বরূপী যজমান বাল্যকাল হইতেই ছাড়া থাকে। কপালে জয়পতাকা বাঁধা আছে; কিন্তু কার সাধ্য জয় করে? স্কুল মাষ্টার, ঘরের মাষ্টার, মা বাপ, ভাই বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন, কেহই সে ছেলেকে শাসন করিতে পারিল না; জয় করিতে পারিল না। দিগ্বিজয়ী সেই বালক অবশেষে যথাকালে আসিয়া প্রণয়িনীর চরণে মস্তক লুটাইলেন; প্রণয়-যজ্ঞে আত্মবলিদান করিলেন; যজ্ঞ সমাধা হইয়া গেল; যজমান অশ্বমেধের ফললাভ করিলেন। স্বর্গের সম্পদে, অপ্সরার প্রেমালিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া কৃত-কৃতার্থ হইলেন।

এখনকার দুর্গোৎসবকে অনেকেই সেকালের অশ্বমেধ যজ্ঞের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। ভালবাসারূপ মহা-যজ্ঞও অনায়াসে দুর্গোৎসবের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। ভালবাসা দুর্গোৎসব বটে। বিচ্ছেদ ইহার বিজয়া, পূর্ব্বরাগ ইহার বোধন। বলি হোম, আরতি উপাসনা সকলই ইহাতে আছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দুর্গোৎসবে যেমন মহিষাসুরবিমর্দ্দিনীর পূজা, ভালবাসাতেও তেমনি পুরুষাসুরবিমর্দ্দিনীর উপাসনা বৈ আর কিছুই নয়। তিনিই সব; তিনিই আদ্যাশক্তি, তাঁহার সেবা করিলেই আর আর সকলেই পরিতুষ্ট। লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, ইঁহারা দল বল বৈ ত নয়।

দশ হস্তে তিনি আহার করিতে, আলায় করিতে আসিয়াছেন, মুঠা ভরিয়া তাঁহাকে যথা-সর্ব্বস্ব উৎসর্গ কর, দেবী বরদা হইয়া তোমার চৌদ্দপুরুষকে চরিতার্থ করিবেন। ইহারই নাম দুর্গোৎসব, ইহারই নাম প্রণোৎসব। অশ্বমেধ যজ্ঞের সহিত এই দ্বিবিধ উৎসবেরই সমানে তুলনা হইতে পারে।

ভালবাসাকে অশ্বমেধ না বলিয়া গোমেধ বলিতে হয় বল, তাহাতেও আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। সে স্থলে কেবল যজমানকে অশ্ব না বলিয়া গো-সদৃশ ভাবিয়া লইলেই চলিবে। বাস্তবিক অনেক গো-বেচারা অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, এই কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বসে। অবশেষে ল্যাজে-গোবরে হইয়া যজ্ঞকুণ্ডে পড়িয়া ছট ফট করিতে করিতে গো-জন্মে ইহ লীলা অবসান করে। আর ভালবাসাকে নরমেধ যজ্ঞ বলিলে ত কোন কথাই থাকে না। এত নরবলি আর কোন্ যজ্ঞে হয় বল? কোন কালীতলাতেও এত নরবলি কখনও হয় নাই। শ্মশান কালী মশান কালী, কশাই কালী ডাকাতে কালী, এত নরবলি খাইতে আর কেহ কখনও পায় নাই। ভালবাসার যজ্ঞে যে খর্পর পাতা আছে, মানুষ লাখে লাখে গিয়া সাধ করিয়া সেখানে গলা পাতিয়া দিতেছে। এমন অদ্ভুত যজ্ঞ জগতে আর কি আছে বল? মরণের পথ সকলেরই জন্য পরিষ্কার করা আছে। "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা," যজ্ঞের জন্যই পশুর সৃষ্টি, আর ভালবাসিবার জন্যই যদি মানবের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে মরণের এমন সহজ পথ ত আর কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। ভালবাসাই ভাই! উৎকৃষ্ট নরমেধ যজ্ঞ।

ভালবাসাকে রাজসূয় যজ্ঞ বলিলে উপমালঙ্কারে বিশেষ কোন দোষ পড়ে না। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন; ভালবাসার রাজসূয় ঘরে ঘরে হইতেছে। এ রাজসূয়ের প্রণালী ঈষদ্বিভিন্ন, তারতম্য বড় অধিক নাই। যুধিষ্ঠির রাজসূয় করিয়া, যাবদীয় নৃপতিবর্গকে আপনার অধীন করিয়া, আপনি চক্রবর্ত্তী ভূপালরূপে সর্ব্বোচ্চ পদে বিরাজ করিয়াছিলেন। ভালবাসার রাজসূয়ে যজমান আপনি সর্ব্বোচ্চ না হইয়া, সকলকে ছোট করিয়া, প্রণয়-পাত্রীকে সর্ব্বোচ্চ পদে সংস্থাপিত করেন। ভালবাসার রাজসূয়ে প্রণয়িণী রাই-রাজা, যজমান কৃষ্ণ-কোটাল। রাজসূয়ের একটা লক্ষণ এই যে, এ যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ সকলই অধীনস্থ নৃপতিবর্গের হস্তে সম্পন্ন করাইয়া লইতে হয়। ভালবাসার রাজসূয়ে এরূপ অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। পিতা মাতাদি গুরুজন এ যজ্ঞে লঘু হইয়া, পুত্র ও বধূমাতার অধীনে থাকিয়া যজ্ঞকর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। স্বয়ং মাতা এ যজ্ঞে দাসীত্বে নিয়োজিতা, রন্ধনের ভার তাঁহারই হাতে। পিতা বাজার-সরকার, জ্যেষ্ঠ ভাই উপায়-হীন হইলে তিনি চাকরের সর্দ্দার। মাসী, পিসী, ভগিনী, কুটুম্বিনী সকলেই রাজ্ঞীর সেবাকারিণী; আর স্বয়ং যজমান তাঁহার পদরজোভোজী পরমকিঙ্কর। রাজ্ঞী আসমুদ্রকর-গ্রাহিণী। রাজসূয়ের আর বাকী কি?

যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম, ভালবাসাও ত তাই মহাকাম্য। জ্ঞানকাণ্ডে যাঁহার অধিকার হইয়াছে, কর্ম্মকাণ্ড তাঁহার পক্ষে বিহিত নয়। জ্ঞানমার্গে যাঁহার প্রবেশ লাভ হইয়াছে,

ভালবাসার কর্ম্মভোগ তাঁহাকেও আর করিতে হয় না। যজ্ঞের ফল স্বর্গ, ভালবাসার ফল সুখ। এ দুইই অনিত্য, দুই অসার। অনিত্য স্বর্গসুখের মায়া ত্যাগ করিয়া যিনি নিত্য-পদার্থে চিত্তসমর্পণ করিতে পারেন, মোক্ষধাম তাঁহারই আয়ত্ত হইয়া আসে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন্ধু ব্রজরাজের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, করতালির চটপটরবে সভাস্থল আকুল হইয়া উঠিল। সেই তুমুল কোলাহল নিরস্ত হইতে না হইতে বক্তা নবকুমার জোড়্ পায়ে খাড়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতার তান ধরিয়া ফেলিলেন। নবকুমার নবীন যুবক—চোকে চশ্‌মা, বুকে চাদর ও চেন, গায়ে পার্শী কোট। বিজ্ঞানে ও ফরাসী ভাষায় ইহাঁর দারুণ অনুরাগ, এই জন্য লোকে ইহাঁর নামটিকে ফরাসী করিয়া "মুশে বোকোঁ" বলিয়া সময়ে সময়ে ইহাঁকে সম্বোধন করিত। বোকোঁ সাহেব সমুত্থিত হইয়াই, উর্দ্ধাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া আরম্ভ করিলেন—

ভদ্রগণ! সভ্যগণ! ও প্রিয় ভগিনি!

শেষ পদটা উচ্চারণ করিবামাত্রই সভাস্থলে একটা হাসির রোল উঠিল। বক্তা জিব্ কাটিয়া সাম্‌লাইয়া লইলেন; বলিলেন ভ্রাতৃগণ! ক্ষমা করিবেন। অভ্যাসদোষে আমি একটি অতিরিক্ত সম্বোধন-পদ প্রয়োগ করিয়া ফেলিয়াছি। আসল কথা, ভগিনীহীনা সভাকে, অর্দ্ধাঙ্গরহিত সভাকে (address) সম্বোধন করা আমার তাদৃশ অভ্যস্ত নয়। এ সভার অঙ্গহীনতা প্রতিপন্ন করিতে গেলে স্বতন্ত্র একটি বক্তৃতা করিতে হয়। সে অবকাশ আপনারা দিবেন না, সুতরাং মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

ভালবাসা শব্দটা ব্যবহার করিয়া আপনারা বড় ভাল

কাজ করেন নাই। উহা তাদৃশ সুরুচিসঙ্গত নয়, উহাতে অশ্লীলতার গন্ধ আছে। ভগিনীসম্প্রদায়ের সম্মুখে উহা প্রয়োগ করা যায় না। টপ্পায় উহার বহুল প্রয়োগ আছে, অতএব সভ্যসমাজে উহা পরিহার্য্য। আমরা উহাকে "পবিত্র প্রেম" নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, আপনাদের মতানুসরণ করিয়া, আপনাদের মুখ চাহিয়া, ভালবাসাকে ভালবাসা বলিতে আমি বিশেষ কোন আপত্তি করিব না; বিশেষতঃ এ সভায় ভগিনী-মণ্ডলীর সমাগম যখন নাই, তখন রুচিবিষয়ে তাদৃশ সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজনও আমি দেখি না।

বৈজ্ঞানিক ভাবে ভালবাসার আলোচনা করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের চক্ষে না দেখিলে, কোন বিষয়েরই গূঢ় রহস্য নির্ণীত হয় না। বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি জন্যই আমি ভালবাসার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, একাল পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরীক্ষা করিয়াছি। পরীক্ষার ফল যদিও অল্প মাত্র পাইয়াছি বটে, কিন্তু ভরসা আছে, উক্ত বিষয়ে আরও গাঢ় প্রবেশ করিয়া, উহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে পারিব, এবং প্রণয়বিজ্ঞানের পূর্ণ রহস্য আবি-ষ্কার করিয়া বিজ্ঞানজগতে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিব। তখন প্রণয় আর (imperfect science) অপরিপক্ক অথবা কাঁচা বিজ্ঞান বলিয়া, অনধীত বিদ্যা বলিয়া, অগ্রাহ্য হইবে না; পরন্তু অঙ্কশাস্ত্রের ন্যায় সুনিয়মে অভ্যস্ত ও পঠিত হইতে পারিবে। অধিক কি, বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে উহা নির্দ্দিষ্ট হইবার উপযোগী হইবে। কেনই বা না হইবে?

প্রণয়ের পঙ্কোদ্ধার করিলে, প্রণয়কুসুমে কুসংস্কাররূপ যে সকল শৈবালদাম জড়িত আছে তাহা হইতে উহাকে বিমুক্ত করিলে, আর বিজ্ঞানের, স্বচ্ছ পরিচ্ছদে উহাকে বিভূষিত করিলে, পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর হস্তে, কোমলপ্রাণা ষোড়শীর কমলকরে পরম সমাদরে উহাকে সমর্পণ করিতে কোন্ মূর্খ আপত্তি করিবে? (ঘন ঘন করতালি।) হায় জগদীশ! সে দিন কবে আসিবে? করুণাময় প্রভো! তোমার কৃপাবলে আমার জীবনে যেন এ মহাযোগ সাধন করিয়া যাইতে পারি। অভাগা অবলাকুলের উদ্ধারের জন্যই আমার এ বিষম চেষ্টা। এ চেষ্টা কি সফল হইবে না? অবশ্যই হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভালবাসার বিজ্ঞানতত্ত্ব এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই আমি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। কিন্তু অঙ্কুর পাইয়াছি, মহীরুহ অচিরেই উৎপন্ন হইবে; পাদপ শাখাবিস্তার করিলে ফললাভেও আর বিলম্ব থাকিবে না। সামান্য আতাফলের পতন দেখিয়া মহামতি নিউটন আবিষ্কার করিলেন যে জড়জগতের মূল নিয়ম মাধ্যাকর্ষণ। সেই মাধ্যাকর্ষণ হইতে জড়বিজ্ঞানের কি মহতী উন্নতিই এখন্ সাধিত না হইয়াছে? আমিও তেমনি বহুল পরীক্ষায় জানিতে পারিয়াছি যে প্রণয়জগতেরও মূল নিয়ম এক প্রকার আকর্ষণ। উহাকে আসঙ্গাকর্ষণ নামে সচ্ছন্দে অভিহিত করিতে পারা যায়। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সঙ্গলাভের জন্য যে লিপ্সা, সাদা কথায় যাহাকে সঙ্গলিপ্সা বলে, বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকেই আমি আসঙ্গাকর্ষণ বলিতেছি। কাব্যে

আসঙ্গলিপ্সা শব্দের প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু আসঙ্গলিপ্সার উৎপত্তি কোথা হইতে হয়, কবি বা অকবি কেহই তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। সেই ব্যাখ্যার জন্যই বিজ্ঞানের প্রয়োজন।

সকলেই জানেন পরমাণুর সমষ্টিতে মানবদেহের সমুৎপত্তি হইয়াছে। পরমাণু সকল নানাজাতীয় ও বিবিধ প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট। লৌহ ও চুম্বকের ন্যায় কতকগুলি পরমাণু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। চুম্বকজাতীয় পরমাণু স্ত্রীজাতির শরীরে নিহিত আছে, পুরুষ-লোহাকে এই জন্য তাহারা সতত আকর্ষণ করিতেছে। চুম্বকের আকর্ষণে লোহা কখনও স্থির থাকিতে পারে না, ছুটিয়া গিয়া উহার গায়ে লাগিয়া যায়। কদাচিৎ দুই একটা গায়ে-পড়া স্ত্রীলোকও দেখিতে পাওয়া যায়; সেটা স্বভাবের ব্যতিক্রম, সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে চুম্বকজাতীয় পরমাণু সেই পুরুষ ও লৌহজাতীয় পরমাণু সেই স্ত্রীলোকের শরীরে সমধিক পরিমাণে আছে।

এখন কথা হইতেছে যে, স্ত্রীলোকমাত্রের শরীরেই যদি চুম্বকজাতীয় পরমাণু ও পুরুষমাত্রের দেহেই যদি লৌহজাতীয় পরমাণু নিহিত থাকে, তবে সকলে সকলকে আকর্ষণ করে না কেন? এই টুকুই ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব—বুঝিবার কথা, শিখিবার কথা, আলোচনা করিবার কথা। প্রণয়রাজ্যের এই চুম্বক ও লোহা আবার নানা ধর্ম্মের, নানা স্বভাবের ও নানা জাতীয় আছে। যে জাতীয় চুম্বক যেরূপ লোহাকে আকর্ষণ করে, সেই লোহা যে পুরুষের শরীরে অধিক পরি-

মাণে আছে, সে সেই চুম্বকময়ীকে দেখিয়া অবশ্যই পাগল হইবে। চুম্বকময়ীও তাহাকে দেখিয়া, নীরবে, অন্তরে অন্তরে, আভ্যন্তরীণ শক্তিপ্রয়োগে সেই পুরুষকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রাণান্তপণে চেষ্টা করিবে। ইহারই নাম অনুরাগ, সেই অনুরাগের পরিণতিকেই প্রেম কহে।

অপরিপক্ক বয়সে আকর্ষণ-শক্তির স্ফূর্তি হয় না। যৌবন-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মানবদেহে এক প্রকার তাপের উৎপত্তি হয়, সেই তাপের প্রভাবে দেহের অবিকসিত অংশনিচয় ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে থাকে, আর সেই সময় উপযুক্ত পাত্রের সাক্ষাৎ পাইলে; তাপ-তাড়িতের ধর্ম্মে পরস্পরের হৃদয়কমল প্রফুল্ল হইয়া, মিলন জন্য আকুল হইয়া উঠে। কোন্ জাতীয় চুম্বক কোন্ জাতীয় লৌহকে অধিকতর আকর্ষণ করে, কাহার শরীরে কিরূপ পরমাণু কত পরিমাণে সন্নিবিষ্ট আছে, এ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের পরীক্ষা যে দিন শেষ হইবে, জ্যামিতির (Theorem) উপপাদ্যের ন্যায় মূল সত্য যে দিন আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে, সে দিন হে বিজ্ঞান! তুমি চরিতার্থ হইবে, প্রণয়! তোমার রাজ্য অক্ষয় হইবে, আর হে সীমন্তিনি! তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী সর্ব্বোচ্চ সোপানে সমারোহণ করিবে। প্রণয়ের পাত্রান্বেষণ জন্য তখন আর অন্ধকারে লোষ্ট্রক্ষেপ করিতে হইবে না, জাঁকড়ে ভালবাসিয়া যাচাইয়ে পছন্দ হইল না বলিয়া আর মাল ফেরত দিতে হইবে না; বিধবাবিবাহের জন্য শাস্ত্র খুঁজিতে হইবে না, বাল্যবিবাহ উঠাইবার জন্য আইনের আবশ্যক হইবে না, জাতিভেদে জল দিবার জন্য জল-বেড়াবেড়ী করিতে হইবে না।

প্রণয়বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারের উপর মানবজগতের কিরূপ মহান্ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া না বুঝাইলে আপনারা হয় ত তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিতেছেন না। মনে করুন, এখনকার এই যে ভালবাসা এ কেবল অন্ধকারে ঢিল মারা বৈত নয়। আমাকে ভালবাসে বলিয়া আমি আন্দাজী একজনকে প্রণয়পাত্রী বলিয়া ধরিয়া লইলাম, অবশেষে ব্যবহারে জানিলাম সে আশা বৃথা, সে ধারণা ভ্রান্তিমূলক। কাজেই তখন অনুতাপ অবসাদ, বিকার বিরহ, পরিহার প্রহসন সে ভালবাসার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে বৈ আর কি? কিন্তু কোন্ জাতীয় চুম্বক আমাকে সমধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিবে ইহা যদি জানিতে পারা যায়, এবং সেই চুম্বক কাহার শরীরে বিদ্যমান আছে ইহা নিরূপণ জন্য যদি একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়, তবে কি প্রণয়রাজ্যের সকল কষ্ট একবারে ঘুচিয়া যায় না? তাহা হইলে সেই যন্ত্র হাতে করিয়া এক কথা-তেই জীবনের সঙ্গিনী জন্মের মত খুঁজিয়া লওয়া যায়। এবং

প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভাল বাসি, সে যদি ভাল বাসিত॥

এ গান—এ হতাশের গান, কোন হতভাগ্যকেই আর গাহিতে হয় না। যন্ত্র লাগাও আর প্রণয়ের সওদা কর, কোন বালাই নাই। কোর্টশিপে তাহা হইলে কোন কষ্টই থাকিবে না, ডাইভোর্স কোর্ট একবারে উঠাইয়া দিলেও চলিবে। আর কোর্টশিপ নহিলে যে বিবাহ অসিদ্ধ এ কথাও নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে পারা যাইবে।

বিধবা-বিবাহ প্রচলন জন্য তখন আর বিদ্যাসাগরকে বেগ পাইতে হইবে না। যন্ত্রের সাহায্যে যাই দেখিবে যে অমুক বিধবার দৈহিক চুম্বক অমুক পুরুষের আকর্ষক, অমনি সম্বন্ধ স্থির, তখনি বিবাহ। সে বিবাহে বাধা দেওয়া তখন অপরাধ বলিয়া দণ্ডবিধি আইনে দণ্ডার্হরূপে গণ্য করিতে পারা যাইবে। বাল্যবিবাহ, ঐ যন্ত্রের সাহায্যেই অনায়াসে রহিত করা যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকালে আসঙ্গা-কর্ষণের স্ফূর্ত্তি হয় না। আকর্ষণের আভাস না পাইলে পাত্র স্থিব হইবে না, সুতরাং বিবাহ অসাধ্য এবং হইলেও তাহা অসিদ্ধ হইবে। তাহার পর বাকী রহিল কেবল জাতিভেদ। যন্ত্রের সাহায্যে সে পাপ রাক্ষসকে বিনাশ করা ত অতি সহজ কথা। যন্ত্রটি বিজ্ঞানের জলন্ত অবতার স্বরূপ হইবে। বাগ্দিনীর চুম্বকে ব্রাহ্মণের দেহ, অথবা ব্রাহ্মণীর চুম্বকে চণ্ডালের দেহ আকর্ষণ করিতেছে যন্ত্র যখন জলন্ত প্রমাণে প্রতিপন্ন করিয়া দিবে, তখন কুসংস্কার-ভরা, কুমন্ত্রণা-ময়, যুক্তিহীন, মাথামুণ্ডহীন অসার তুর্কে জাতিভেদের জীবন কি আর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিবে? কখনই না। বাস্তবিক বিবাহে জাতিভেদটা সে কালের কবিরাও বড় মানিতেন না। ভারতচন্দ্রের সুন্দরই স্বয়ং বলিয়াছেন,—

> পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়?
> প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়॥

পণমূলক বিবাহে জাতিভেদের প্রয়োজন নাই বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিবাহ-মাত্রেই জাতিভেদ রহিত করার বিধান সঙ্কেতে উপদিষ্ট

করাই ভারতচন্দ্রের উদ্দিষ্ট। ভারতচন্দ্রের এই টুকুই আমি ভাল বলি। এই তত্ত্বটুকু আবিষ্কারের জন্যই আমি বিদ্যা-সুন্দর পাঠ করিয়াছিলাম, নহিলে রুচিবিরুদ্ধ ঐ জঘন্য গ্রন্থের নাম করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। প্রণয়বিজ্ঞানের সত্য পরীক্ষা জন্য আমাকে অনেক নরক ঘাঁটিতে হইতেছে, ভবিষ্যতে আরও কত হইবে কে বলিতে পারে? এক জন ফরাসী পণ্ডিত পরীক্ষা জন্য বিষ্ঠার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব আমি যে বিদ্যাসুন্দর পড়িব এবং বিদ্যা বা অবিদ্যা-মহলে আরও কত বিচরণ করিব, তাহা আর বিচিত্র কি!

এখন একটা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিলেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। ফরাসীদেশের কোন পণ্ডিত প্রণয়-পরীক্ষার একটি যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছেন আমি শুনিয়াছি। করুণাময় তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, তাঁহার কাছে আমি এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারিব; এবং এজন্য যদি আমাকে স্বয়ং সশরীরে ফরাসী রাজ্যে গমন করিতে হয়, তদর্থে চাঁদা তুলিবার চেষ্টা অবশ্যই করিব। কিন্তু এই যন্ত্র নির্ম্মাণব্যাপারে একটা কথা আমার বড় মনে পড়িয়া গেল। আমাদের প্রাচীন ভারত প্রণয়বিজ্ঞানের পরীক্ষা বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যে কৃষ্ণকে হিন্দুরা দেবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করে, তাঁহাকে আমি প্রণয়বিজ্ঞানের এক জন মহাপরীক্ষক বলিয়া মনে করি। কৃষ্‌ ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দের উৎপত্তি। কৃষ্‌ অর্থে আকর্ষণ, তবেই দেখ সেই আসঙ্গাকর্ষণের আভাস ইহাতেই কেমন পাওয়া যাইতেছে। শুধু তাই নয়, স্বভাবের ব্যতিক্রমেই

হউক, বা যে কোন কারণেই হউক, কৃষ্ণ নামে অভিহিত যে ব্যক্তি, তাঁহার শরীরে সকল প্রকার চুম্বকজাতীয় পরমাণুর সমষ্টি এত অধিক পরিমাণে নিহিত ছিল যে, রমণীমাত্রকেই তিনি অনায়াসে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। আর প্রণয়বিজ্ঞানের বহুল চর্চ্চা করিয়া এবিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতাও এমনি জন্মিয়াছিল যে, যন্ত্র-নির্ম্মাণব্যাপারেও তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হয়। তাঁহার সেই বাঁশীটি বড় সামান্য যন্ত্র ছিল না। গানে আছে,—

বাঁশী কি বিষম যন্ত্র!

আমার মতে সেই বাঁশীটা কেবল যে বাঁশের বাঁশী ছিল তাহা নয়। তাহাতে এমন কোন পদার্থের সংযোগ ছিল যে, উহার স্বরে আকৃষ্ট হইয়া গোপরমণীরা গৃহসংসার ত্যাগ করতঃ কুঞ্জবনে গিয়া কৃষ্ণপ্রেমের কাঙ্গালিনী হইয়া দাঁড়াইতেন। সেই বাঁশীর রবেইত—

গোপীর কুলে থাকা হলো দায়!

এটা কিন্তু কৃষ্ণের কুটিলতা বলিতে হইবে। কৃষ্ণ লোকটা চতুর ও বুদ্ধিজীবী ছিলেন বটে, বিজ্ঞানসেবাও তাঁহারি জীবনের ব্রত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার ব্রতের উদ্দেশ্য গোপ-জাতীয়া রমণীমণ্ডলীকে তাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট করা। বাল্যে ননী মাখন চুরি করিয়া খাইয়া কোন উপায়ে তিনি, গোপজাতীয়া রমণীকে আকর্ষণ করিতে পারে এরূপ পরমাণু তাঁহার দেহে সমধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিলেন; তার পর সেই অলৌকিক বাঁশী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার সাহায্যে গোপকুলের কুল মজাইয়াছিলেন। বিজ্ঞানসেবায়

এই অধর্ম্মাচরণ প্রবেশ করাতেই তাঁহার অধঃপতন হইল, তাঁহার আবিষ্কৃত প্রণয়-বিজ্ঞানও অকালে বিলয় প্রাপ্ত হইল। তাঁহাব সেই বাঁশীটার ভগ্নাংশ পাইলেও আমার অনেক উপকার হইত। সে বাঁশীটায় যে ভেল্কী বাজী হইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বাঁশীর গানে পাড়ার মেয়ে জড় হইত। স্বয়ং বেদব্যাস সাক্ষ্য দিযাছেন,—

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

সেই মদনবর্দ্ধন বাঁশীর গানে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজাঙ্গনারা দ্রুতপদে কাণের কুণ্ডল দোলাইয়া কৃষ্ণসমাগমে ছুটিল। সকলেই আপনা আপনি চলিল, কেহ কাহারও চেষ্টা জানিতে পারিল না।

বাঁশীর মহিমা একজন বৈষ্ণব কবি কেমন বর্ণনা কবিয়া ছেন দেখুন,—

বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লয়ে যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥
হা রে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আন্‌চান্॥
সতী ভুলে নিজ পতি, মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥

বাঁশীর গানে ব্রজরমণী সত্য সত্যই পাগল হইত—

সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পাগল হিয়ার মাঝে।

বয়স্ক তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে॥

গোবিন্দদাস বলিয়াছেন, বাঁশীর গানে গোপীগণ ভাল করিয়া কাপড় পরিবারও অবকাশ পাইত না।

কি শুনি সুধা মুরলী বুক।
না সম্বরে অম্বর আকুল গোপী সব॥

বাঁশীটাকে গোপীরা বড় ভয় করিত। এক একদিন বড় বিরক্ত হইয়া, প্রণয়কোপে ভ্রুকুটি করিয়া তাহারা বলিত—

বাঁশী কেড়ে নিব শ্যাম!

শ্যামের বাঁশী শ্যামের সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও হিন্দুর মেয়েরা বাঁশীর নামে যেন শিহরিয়া উঠে। এখনও সন্ধ্যাকালে, বাঁশীর ঝঙ্কার শুনিলে, এক ছেলের মা রাত্রিকালে অন্নজল পরিত্যাগ করে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, কৃষ্ণের সেই মুরলী একটা বিষম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বৈ আব কিছুই নয়, আর স্বয়ং কৃষ্ণ আর কেহই নয়—প্রণয়-বিজ্ঞানের এক জন বিজ্ঞতম পণ্ডিত মাত্র। বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষ্ণ-চরিত্রের আলোচনা করিতে পারিলে, যন্ত্রতত্ত্ব এবং প্রণয়-বিজ্ঞানের বিবিধ তত্ত্ব অনায়াসে আবিষ্কৃত হইতে পারে। সে পক্ষে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। করুণাময়ের কৃপায় আমার এ ব্রত কি সফল হইবে না? হায়! বাঁশীর মত একটা মহা-যন্ত্র আমি কবে হাতে পাইয়া, অবলাজাতির অনন্ত দুর্দ্দশা মোচনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব? সে দিন বুঝি নিকট। হে প্রিয় ভগিনি! হে অভাগিনি! তোমাদের দুঃখযামিনী অচিরেই অবসান হইবে।

গতা বহুতরা কান্তে স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।

হে সভ্যবৃন্দ! আপনারাও সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যে, কুসংস্কাররূপ কাল-রজনীর অবসানে, বিজ্ঞানের বালারুণকিরণে, প্রণয়রাজ্যের নরনারী যেন দিব্যালোকে আলোকিত হইতে পারে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরে ওঁ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বক্তা নবকুবার বসিতে না বসিতেই ডাক্তার শমনসুহৃদ সমুত্থিত হইয়া সভ্যবৃন্দকে সম্বোধন পুরঃসর আরম্ভ করিলেন—

সভ্যগণ !

আমি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। সুতরাং সহজেই আপনারা বুঝিতে পারেন যে, চিকিৎসকের চক্ষেই আমি ভালবাসার সমালোচনা করিব, এবং তাহাই আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমি নিজে বিশ্বাস করি। আমার মতে ভালবাসা একটা বিষম ব্যাধি। "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং।" মানবদেহ ব্যাধির নিবাসভূমি। বিধাতা যে অসংখ্য প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছেন, ভালবাসাও তাহার মধ্যে একটা মহাব্যাধি। শুধু মহাব্যাধি নয়, এ রোগ আবার দুরারোগ্য, দুশ্চিকিৎস্য। যেমন বাতশ্লেষ্মা বহুমূত্র, ক্ষয়কাশ যক্ষ্মাকাশ, ওষ্ঠব্রণ পৃষ্ঠ-ব্রণ, কুষ্ঠ বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ দুশ্চিকিৎস্য ; ভালবাসাও তেমনি এক প্রকার অসাধ্য ব্যাধি। ভালবাসা বরং অন্যান্য সকল রোগ অপেক্ষা আরও কঠিন। অন্যান্য রোগ, দুশ্চি-কিৎস্য হইলেও চিকিৎসাশাস্ত্রে, তাহাদের যাহা হউক এক একটা চিকিৎসার বিধান আছে ; কিন্তু ভালবাসার চিকিৎসা-বিধি কোন চিকিৎসাশাস্ত্রেই নাই। আয়ুর্ব্বেদে বা আলো-পেথিতে, হোমিওপেথি বা হকিমীতে, কোনমতেই ইহার চিকিৎসাতত্ত্ব নিরূপিত হয় নাই। চিকিৎসা চুলোয় যাক, রোগটার নাম পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসাগ্রন্থে খুঁজিয়া পাই না।

আমি ডাক্তারী করি, আমার কিন্তু ঘোর বিপদ! সময়ে সময়ে এক একটা রোগী আমার হাতে এমন আসে যে, কিছুতেই তাহার রোগনিরূপণ করিয়া উঠিতে পারি না। রোগীর বাহ্যব্যাধি কোথাও কিছু নাই, হয় ত বলিল, "বুকে বড় বেদনা বোধ হইতেছে।" চোঙ্ বসাইয়া চৌচাপটে পরীক্ষা করিয়া দেখি, কোথাও কিছু পাই না। হৃদ্-যন্ত্রে ফুস্ফুসে, শিরায় ধমনীতে কোনরূপ বিকৃতি নাই, কোন ব্যাধিলক্ষণ নাই। লক্ষণ না পাইলে রোগ নির্ণয় করি কি-রূপে? প্রাণপণে পুঁথি হাতড়াইয়াও কোনরূপ কুল-কিনারা করিয়া উঠিতে পারি না। আমি মেডিকেল কলেজের মার্কামারা ছাত্র, পাসের পতাকা স্বগুণে সঞ্চয় করিযাছি। কিন্তু আমার বিদ্যার দৌড় কেবল ঐ খানেই শেষ হয় নাই। আমি হকিমী হাতড়াইয়াছি, হানিমানের হতিশও হস্তগত করিয়াছি, আর কবিরাজকুলের সহিতও আমার কোলাকুলী আছে। তথাপি ঐ "বুকে-ব্যথা ব্যাধির" কোন বিধান বহু চেষ্টায় আমি বাহির করিতে পারি নাই।

সভ্যগণ! ক্ষমা করিবেন, আমার ভাষাটা সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ অনুপ্রাসময় হইয়া উঠে। তাহার কারণ, কবিকুলের সহিত আমার সম্বন্ধ কিছু ঘনিষ্ঠ। সে সম্বন্ধ থাকায় এ সম্বন্ধে কিছু উপকার পাইয়াছি বটে। ডাক্তার কবিরাজের কাছে ভালবাসা রোগের কুল কিনারা না হউক, কিন্তু কবিকুলের কাছে রোগের লক্ষণ কতকটা জানিতে পারা যায়। চিকিৎসা তাঁহারা জানেন না, কিন্তু রোগের বিবরণ তাঁহাদের কাছেই পাওয়া যায়। অতএব ভালবাসা বিষয়ে

এক্ষণে আমার নিজের মত না চালাইয়া, কবিকাহিনী যৎ-কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া, বর্ত্তমান বক্তৃতায় আপনাদিগকে একটু বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে আর কিছু না হউক, রোগটা যে বড় কঠিন, অন্ততঃ এ কথাও কবিকুলসাহায্যে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতে পারিব।

কবিকুলের তত্ত্ব লইতে হইলে, কালিদাসকেই ভালবাসার মহাকবি বলিয়া মান্য করিতে হয়। সেই "কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।" শকুন্তলায় কালিদাস প্রণয়ব্যাধির লক্ষণ কিরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখুন। শকুন্তলা দুষ্মন্ত-দর্শনে রোগাক্রান্তা হইয়াছেন। সখীদ্বয় লতাকুঞ্জমধ্যে তাঁহাকে লইয়া গিয়া, সুশীতল শিলাতলে কুসুমশয্যায় শয়ন করাইয়া, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লিপ্ত করিয়া পদ্মপত্র দ্বারা বীজন করিতেছেন। খানিক বাতাস করিয়া সখীরা জিজ্ঞাসিলেন—

হলা শউন্তলে! অবি সুহাঅদি দে নলিনীবত্তবাদো?

হ্যাঁলা শকুন্তলা! পদ্মপাতার বাতাসে তোর আরাম বোধ হইতেছে কি?

শকুন্তলা উত্তর করিলেন—

কিং বীজঅন্তি মং পিঅ সহীয়ো?

সই! তোমরা আমায় বাতাস করিতেছ না কি?

সখীরা অবাক্ হইয়া পরস্পরের মুখ তাকাইয়া রহিল। নদীতীরে লতামণ্ডপমণ্ডিত কুঞ্জবন, তন্মধ্যে সুস্নিগ্ধ শিলাতলে কুসুমের সুখশয্যা; সেই শয্যায় শয়ন করিয়া, প্রিয়সখীর কোমলকর-সঞ্চালিত কমলপত্রবীজনে যাহার শরীরতাপ শমিত

হওয়া দূরে থাকুক—সমীরসঞ্চারণ অনুভূতই হয় না, তাহার অঙ্গে কি বিষম ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে, কাহার সাধ্য নির্ণয় করে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং দুষ্মন্ত—যিনি রোগের গোড়া, তিনিও সেই লতামণ্ডপের আড়ালে আড়ি পাতিয়া মনে মনে তর্ক করিতেছেন—

তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ, উত যথা মে মনসি বর্ত্ততে?

অর্থাৎ, এ অসুখ কি গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ, না আমার মনে যা উদয় হইতেছে ঠিক্ তাই?

চিকিৎসকের বাপের সাধ্য এ রোগ নির্ণয় করিতে পারে?

কালিদাসের কথা শুনিলে, এখন আর এক শ্রেণীর কবির কাছে চল। জয়দেব সে শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবি। জয়দেব গোঁসাই এ রোগের লক্ষণ কিরূপ দিয়াছেন দেখা যাক। কালিদাসে স্ত্রীলোকের পক্ষ দেখিয়াছি, জয়দেবে পুরুষপক্ষ পরীক্ষা করা যাক। এ আবার যে সে পুরুষ নয়। যিনি স্বয়ং পুরুষপ্রধান পরাৎপর, যিনি মদনমোহন, তিনিও মদনবেদনায় অধীর হইয়া কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক জন সখী স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়া, রাধিকার চরণে তাহাই নিবেদন করিতেছেন—

সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী॥
দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি॥
ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশিরুজমুপযাতি॥
বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহুবিলপতি তবনাম॥

"সখি! বনমালী তোমার বিরহে অবসন্ন হইয়াছেন। সুধাংশুর শীতকিরণে দগ্ধ হইয়া তিনি মৃতপ্রায়। কুসুমপাতে মদনশরাশঙ্কা করিয়া কাতরে ক্রন্দন করিতেছেন। মধু-করের এমন যে মধুর গুঞ্জন, তাহা শুনিয়াও সভয়ে কর্ণবিবর আচ্ছাদন করিতেছেন। বিরহযামিনী দ্বিগুণ হইয়া বাড়ি-য়াছে, পোহাইতে চাহে না। সুরম্য প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি এখন অরণ্যমধ্যে ধুলিশয্যায় লুটাপুটি করিতে-ছেন, আর তোমার নাম লইয়া অবিরত ক্রন্দন করিতেছেন।"

বিরহাবস্থার দুঃখ বর্ণিত হইল। মিলনেই বা শান্তি কৈ? মিলনেও যে প্রকৃতিস্থ হইবার যো নাই, মহাকবি ভবভূতির কাছে সে পরিচয় স্পষ্টই পাওয়া যায়। ভবভূতির রামচন্দ্র, সীতার স্পর্শসুখে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥•

"প্রিয়ে! আমি সুখে আছি কি দুঃখানুভব করিতেছি, আমি নিদ্রিত কি জাগরিত, আমার শরীর বিষাক্ত কি নেসার ঝোঁকে বিহ্বল হইয়াছে, তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তোমার প্রতিস্পর্শে আমার ইন্দ্রিয়সকল বিকল হই-তেছে, আর কেমন এক প্রকার বিকারে অভিভূত হইয়া আমার চৈতন্য এক একবার বিলুপ্ত এবং এক একবার প্রবুদ্ধ হইতেছে।"

সভ্যগণ! আমি ডাক্তার হইয়া ইহাকে নীরোগ অবস্থা বলিয়া কিরূপে মতপ্রকাশ করিতে পারি? সত্য কথা বলিতে গেলে ইহা ত পূর্ণ বিকার! স্বয়ং কবিও ত স্পষ্ট কথায় তাহাই বলিয়া দিয়াছেন।

ভালবাসায় যদি এতই অসুখ—বিরহে বিপদ, মিলনে অতৃপ্তি, পদে পদে যাহাতে অসুখ, তবে ছার ভালবাসা কেন ত্যাগ কর না। সে কথা কে শুনে? রোগে প্রাণ যায়, তবু আরোগ্য ত কেহ চায় না। জুজু দেখিলে প্রাণে আতঙ্ক হয়, তবু সাধ করিয়া, আদর করিয়া সেই জুজুকেই আবার ডাকিবে। এ কি সামান্য বিকার! ঐ শুন রোগীর প্রলাপোক্তি—

পিরীতি নগরে, বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকলি পর॥
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে সদাই থাকিব
পিরীতি গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিশে আলিস ত্যজিব
থাকিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি অঞ্জন লব।

পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব ॥
পিরীতি নাসার বেশর করিব
ছুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

এ রোগের অনন্ত লক্ষণ, অসংখ্য উপসর্গ! এক বিরহ কত প্রকারের আছে, তাহার উপসর্গ কত কোটি আছে, কে বলিতে পারে? নিতান্ত মোটামুটি হিসাবে বিরহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। সামান্য বিরহ, মধ্যম বিরহ, আর উৎকট বিরহ। বিবাদ বিসম্বাদ নাই, মন-ভাঙ্গাভাঙ্গি নাই, কাজের দায়ে দুজনে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, তাহার নাম সামান্য বিরহ। সামান্য বিরহে বিরহিণীর উক্তি নিধু বাবুর মধুমুখে শ্রবণ করুন—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। মধ্যমান।

কেন ভাল বেসেছিলাম তারে!
হেরিতে বাসনা হলে, ভাসি অকূল পাথারে ॥
যৌবন তরি আমার, ভেঙ্গেছে মাঝার তার,
কেমনে হইব পার, পড়েছি বিষম ফেরে।
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি স্থির ভাবে থাকি,
তখনি তাহারে দেখি, উদয় হৃদি মাঝারে ॥

মধ্যম বিরহের লক্ষণ অন্যবিধ। মন-ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়াছে, ভালবাসা যায়-যায় হইয়াছে, বুঝি সে আর আমায় চায় না, বুঝি সে সপত্নীর সোহাগে গা-ঢালা দিয়াছে, তাই আর আমার কক্ষদ্বার দিয়া পথ চলে না; এই সন্দেহের অবস্থায়

দৈবযোগে তাহার সহিত একদিন দেখা হইল। সে ত লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া চলিয়া যায়। তখন বিরহিণী তাহাকে ডাকিয়া যে মর্ম্মোক্তি প্রকাশ করিতেছেন, রামবসুর মর্ম্ম-স্পর্শী ভাষায় ভিন্ন সে ভাবের পূর্ণচিত্র প্রদর্শন করা যায় না—

কবির সুর।

দাঁড়াও দাড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই, চখের দেখা দেখ্‌তে চাই;
কিছু থাক থাক বলে ধরে রাখ্‌ব না।
সুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না॥
দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ হল এ পথে আগমন;
কও কথা একবার কও কথা তোল ও বিধুবদন।
প্রণয় ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি;
এমন ত প্রেম-ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকেরি দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হ'ল বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচেও সথা মাণিক পেলেম না॥
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল।
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল॥
তোমার পরের প্রতি নির্ভর,
আমি ত ভাবি না পর।
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না॥

উৎকট বিরহ অতি ভয়ানক। প্রণয়পাত্র আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে; সে এখন আর আমার নাই, পরের হইয়াছে; পরপ্রণয়ে সে এখন আসক্ত, পরসঙ্গে সুখবিলাসে উন্মত্ত। ইহার নাম উৎকট বিরহ; ইহার বেদনা বড় বিষম, বুকের ভিতর যেন বিকট শেল বিঁধিতে থাকে। বিদ্যাপতির কাব্যে উৎকট বিরহের উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। ব্রজবল্লভ ব্রজধাম

অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কালি আসিব বলিয়া ফাঁকি দিয়া মথুরায় গিয়া ঘরকন্না পাতিয়াছেন। এখন কুব্জা তাঁহার প্রণয়ভাগিনী। এ বিরহে কি রাধিকার প্রাণ স্থির থাকিতে পারে? উধাও চিত্তে তিনি জিজ্ঞাসিতেছেন—

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।
মদন শরাসনে এ তনু জর জর,
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে॥
হামারি নাগর, তথায় বিভোর,
কেমন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাইয়া নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥

প্রণয়পাত্রে কেবল ত্যাগ করিয়াছে, এ বিরহ বরং সহ্য হয়; সে মরিয়া গিয়াছে তাহাতেও মনকে ক্রমে ক্রমে সান্ত্বনা করা যায়; কিন্তু জীবিত থাকিয়া সে পরপ্রেমে আসক্ত, এ যন্ত্রণা অসহ্য। এই উৎকট বিরহের উৎপীড়নে উন্মাদ-রোগের সঞ্চার হইতে পারে। পর ছত্রেই বিদ্যাপতি উন্মাদের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন—

শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর,
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল, কি কাজ শিঙ্গারে,
যামুন সলিলে সব ডার রে।

বৃকভানুনন্দিনী উৎকট বিরহে উন্মাদিনী হইয়া, শ্রী-অঙ্গের বসন ভূষণ উন্মোচন পূর্ব্বক কালিন্দীর সলিলে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছেন। পাগল আর কাহাকে বলে?

বিরহের মত বিরহিণীরও আবার প্রকারভেদ আছে। বিরহিণী নানা প্রকারের আছে। আমি এস্থলে কেবল দুইটা ঠিক বিপরীত-প্রকৃতি-বিশিষ্টার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। একজন প্রকৃতই অবলা ; নায়কের কাছে মনের কথা ফুটিতে পারে না, প্রাণ যায় তবু লজ্জায় বন্ধন ত টুটে না। নির্দ্দয় নাগর যখন তাহাকে কাঁদাইয়া বিদেশে গেল, তখন এক কথা বলিলে, চোক্ কান্ বুজিয়া মনের বেদনা একবার জানাইলে, অন্ততঃ তাহার চক্ষের উপর চক্ষের জল দু এক ফোঁটা ঝরাইলেও হয় ত সে যাইতে পারিত না। কিন্তু লজ্জার খাতিরে, অভিমানের আবদারে, কোমলা বালার সে আচরণ অসাধ্য বোধ হইল। তার পর মধু মনসিজে মিলিয়া যখন অবলার প্রাণে প্রবল শিখা জ্বালিয়া দিল, তখন সখীর কাছে আক্ষেপ হইতেছে—

কবির সুর।

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি বলা হলো না,
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে ;
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ বিধাতারে, নারীজনম যেন করে না।
একে আমার যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এলো ;
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সজনি ;
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।
একি সখি হলো বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান।
মদনে দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ।
প্রাণের জ্বালায় এখন প্রাণে বাঁচা ভার।
লজ্জা পেয়ে বুঝি লজ্জা না রহে আমার॥
কারে এ দুখ কব সই, কত আর প্রাণে সই,
হলো গো সখি একি যন্ত্রণা॥

রাম বসুর এই বিরহিণী লজ্জার পুতলী, প্রেমের পূর্ণ ছবি, সতীত্বের আদর্শরূপিনী। দুরন্ত যন্ত্রণানল অন্তরে চাপিয়া, কত সন্তর্পণে নারীধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন। এখন আর এক জন বিপরীত-বিরহিণীর চিত্র দেখুন। ইনি বলেন—

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—তাল খেমটা।

সহে না সহে না সখি দুরন্ত বসন্ত-জ্বালা।
চল সখি কুল ত্যজি অকূলে দিই প্রেমমালা॥
বিলায়ে যৌবন ডালা, ঘুচাব দেহের জ্বালা ;
করিব আজ প্রেমখেলা প্রেম-তুফানে ভাসিয়ে ভেলা॥

ইহাঁরও সেই "বসন্ত-জ্বালা"। ইনি কিন্তু তাহা সহিবেন না ; ঝিঝিট খাম্বাজে খ্যামটা গাইয়া খ্যামটাওয়ালীর দলে মিশিতে যাইতেছেন। ভালবাসার দায়ে সংসারে এমন বিরহিণী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন কথা হইতেছে, এই যে ভালবাসার এত লাঞ্ছনা, বিরহের এত বেদনা, এ সকল কাহার দোষে হয়? এ অপরাধ কাহার—স্ত্রীলোক, না পুরুষের? তদন্তে এ তত্ত্বের

মীমাংসা হয় না। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে পরস্পরের ঘাড়ে নিরন্তর দোষ চাপাইয়া বেড়াইতেছে। পুরুষ খেদ করিয়া বলেন—

সিন্ধু ভৈরবী। মধ্যমান।

এবার প্রাণান্ত হলে রমণী হব।
পুরুষের যত দুখ নারী হয়ে জানাব॥
মান করে বসে রব, সাধিলে না কথা কব,
অভিমান তার ফিরে লব, পায়ে ধরে সাধাব॥

আবার কামিনী অনেক দিনের পর প্রাণকান্তকে পাইয়া অনুযোগ করিতেছেন—

কাফি সিন্ধু—আড়াঠেকা।

ভালবাসি বলে কিহে আসিতে ভাল বাস না?
আপন করম দোষে না পূরিল বাসনা।
হেরে তব মুখশশী, সুখের সাগরে ভাসি,
তাই বুঝি রেখেছ দাসী, ভাবিতে তব ভাবনা॥

ভালবাসার ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই। কিন্তু আপনা আপনি আত্মচিকিৎসা করিবার চেষ্টা কি কেহ কখনও করে না? ভালবাসার ভোগ ভুগিয়া ভুলিবার চেষ্টা কি কেহই করিতে চায় না? চেষ্টা করে বৈ কি। চেষ্টায় কি ফল ফলে, যে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার মুখেই এজেহার শুও না কেন। ঐ শুন রোগীর জবানবন্দী—

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে।
ভুলিতে যতন করি যাতনাতে মরি প্রাণে॥
দেশেতে হয়েছি দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবেশী,
তবু তারে ভালবাসি, অভিলাষী নিশি দিনে

ভাবি সই গুমানে থাকি, গৃহকাজে মন রাখি,
কিছুতে যে হইনে সুখী, উপায় দেখিনে।
যার লাগি এত জ্বালা, সেই রূপ জপমালা,
কি গুণ করেছে কালা, হেলা হোলো কুলমানে॥

বুঝিলাম, দেখিলে মজিলে যেন আর ভুলা যায় না। কিন্তু না দেখিয়াই বা ক্ষান্ত থাকে কৈ? ভারতের বিদ্যা পণ করিল যে, বিচারে যে না হারাইবে, তাহাকে তিনি প্রাণ সমর্পণ করিবেন না। কিন্তু হারা দূরে থাকুক, না দেখিয়াই, মালিনীর মুখে সুন্দরের সৌন্দর্য্য-বর্ণনা শুনিবামাত্র, তিনি তাঁহার রাঙ্গা পায়ে বিকাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, পণের পসার তখনি ভাঙ্গিয়া গেল। মিলনের জন্য মালিনীর খোসামোদ করিয়া বলিলেন—

কালাংড়া—খেমটা।

কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল
রসে তনু ডগ মগ মন টল টল॥
শিহরিল কলেবর, তনু কাঁ[illegible],
হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোকলাজ, কুলের মাথায় বাজ,
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল॥
রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ করে,
চিত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাঙ্গা পায়,
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল॥

ভারতচন্দ্রের বিদ্যার দোষ কি? শ্রীহর্ষের দময়ন্তীও যে রাজহংসীর মুখে নলরাজার রূপগুণের পরিচয় পাইয়া তদীয়

পাণিগ্রহণজন্য পাগলিনী হইয়াছিলেন। মালিনী ত পদে আছে। ভালবাসার মর্ম্মবুঝা ভার!

প্রণয়ব্যাধিব তত্ত্বান্বেষণ জন্য, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারতচন্দ্রেব পর্য্যন্ত সন্ধান লওয়া গেল। এক্ষণে তথা হইতে একটি লম্ফ দিযা, একবারে বর্ত্তমানে আসিয়া পড়া যাক্। বর্ত্তমানেও বুড়ার দলকে বাদ দেওয়া যাক্। বুড়া বঙ্কিম, হাইকোর্টের হেম, (ঐ দেখ অনুপ্রাস আবার আসিতেছে) ইহাঁরা বর্ত্তমানেব হইলেও বয়সে প্রবীণ হইয়াছেন; সুতবাং সে কালের দলে ইহাঁদিগকে ফেলা গেল। মাইকেল দীনবন্ধু মবিযাছেন, তাঁহারাও মাথায় থাকুন। নবীনও এখন নামে নবীন, বয়সে ঢলিয়াছেন, সুতবাং বাদের ভিতব পড়িয়া গেলেন। টব্‌টবে কাঁচ কবি—বয়সে কাঁচা, কিন্তু লেখায় পাকা, এমন এক জন কবিকে ধবিয়া এ প্রস্তাবের ইতি করা যাক্। হাল আমলের ববি ঠাকুব প্রণযবাজ্যেব এক জন কম পাত্র নন। সেই রবি কবি, ভালবাসা বোগের লক্ষণ কিরূপ দিয়াছেন দেখা যাক্। ববির একটা গান তবে শুনুন—

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

কি হল আমার? বুঝি বা সখি
হৃদয় আমার হারিয়েছি।
পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে
হৃদয় আমার হারিয়েছি॥
প্রভাতকিরণে সকাল বেলাতে,
মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,

মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে ;
মনফুল দলি চলি বেড়াইতে।
সহসা সজনি চেতনা পেয়ে,
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে,
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি॥

সর্ব্বনাশ! দেখ মহাশয়, রোগ ক্রমেই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। পুরাকাল হইতে বর্ত্তমানের ভালবাসা, আরও কঠিন, আরও জটিল, আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া আসিয়াছে। এই দেখুন, একটা লোক সকালবেলা পথে খেলাইতে গিয়াছিল; কোথাও কিছু নাই, কাহারও সহিত তাহার দেখা হয় নাই, নায়কদর্শন তার হয় নাই, কখনও যে হইয়াছিল তাহারও কোন নিদর্শন নাই, অথচ তাহার হৃদয়খানি সে হারাইয়া আসিল। গানটি সুদীর্ঘ বলিয়া শেষাংশ আমি ছাড়িয়া দিয়াছি; কিন্তু শপথ করিয়া বলিতে পারি, তাহার ভিতরেও রোগের গোড়া ত কৈ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; ঐ কেবল হা হুতাশ, আঁধার আব্‌ছায়া, আর অন্বেষণ—যে হৃদয় কোথায় গেল। হৃদয় যার চুরী গিয়াছে, সে নিজেও বলিতে পারিতেছে না যে জিনিসটা গেল কোথায়? গানের শেষ দুই ছত্র দেখুন না কেন—

সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় সজনি হারিয়েছি॥

এমন করিয়া, পথের মাঝে, অকারণে, অদর্শনে, বর্ত্তমানে যদি লোকের মনঃপ্রাণ খোয়া যাইতে থাকে, তবে ত রোগের প্রভাব বড় প্রবল হইয়া উঠিল! ধরিতে ছুইতে,

দেখিতে শুনিতে কাহাকেও পাওয়া যাইবে না, চুরীর কিনারা হইবে কিরূপে? যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, দেখিতেছি, দেখাদেখি ভালবাসার পাত্র পাত্রীগুলাও ক্রমে নিরাকার হইয়া দাঁড়াইল!

আর প্রমাণে প্রয়োজন নাই, কবিকুলকেও আর কষ্ট দিয়া কাজ নাই; তাঁহাদিগকে এখন ছুটি দিতে পারি। আমার যে প্রয়োজন ছিল, তাহা সংসাধিত হইয়াছে। সভ্যগণ এখন বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ভালবাসা বিষম ব্যাধি বটে। ভালবাসা অতি-বিষম জ্বর। বিরহ ইহার বিকার, মিলন ইহার ভোগ, কলহ ইহার প্রলাপ, রোদন ইহার ঘর্ম্ম, ফোঁসফোঁসানি ইহার শ্লেষ্মা, জ্বালা পোড়া ইহার তাপ, বিলাস ইহার রস, আশা ইহার তৃষ্ণা, নিরাশা ইহার অবসাদ, সঙ্কোচ ইহার শৈত্য, পূর্ব্বরাগ ইহার পূর্ব্বলক্ষণ।

এই রোগের দায়ে কত লোক আত্মহত্যা করিয়াছে, কত লোক অপরের প্রাণ হনন করিয়াছে। কত প্রাণী প্রাণের মমতা ছাড়িয়াছে, কত জীব জীয়ন্তে মরা হইয়া আছে। কত গৃহস্থ এই রোগের দায়ে সন্ন্যাসী হইয়াছে, কত যোগী যোগভঙ্গ করিয়া পাপ-সংসারে আবার সুখশয্যা পাতিয়াছে। কত কুলবতী এই রোগে কুলের মাথা খাইয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়াছে, কত কুলাঙ্গার পরের কুল মজাইয়া আপনার কুলে কলঙ্কের কালি মাখাইয়া দিয়াছে। ভালবাসার জন্য কত রাজার রাজ্য গিয়াছে, কত ধনীর ধন সম্পদ উড়িয়া গিয়াছে, কত মানীর মান লুপ্ত হইয়াছে। ভালবাসার সংগ্রামে কত দিক্পাল খসিয়াছে, কত বীরপাত হইয়াছে।

ভালবাসার দায়ে কত সতী পতিহারা হইয়াছে, কত পতি গৃহ-শূন্য হইয়াছেন, কত চাকুরের চাকুরী গিয়াছে, কত ভিক্ষুকের ভিক্ষান্ন বন্ধ হইয়াছে। সবার বাড়া যে ধর্ম্মধন, তাহাও বিসর্জ্জন দিয়া কত লোকে উহার বিনিময়ে ভালবাসা ক্রয় করিতেছে। এই ভালবাসার জন্যই আমাদের তন্নুমিশ্র আকবরের তানসেন হইয়াছিলেন, আমাদের এত সাধের রমারত্ব বিলাতী মেমে পরিণত হইয়াছেন। আর আজিও যে আমাদের অপোগণ্ড বালকেরা বিদ্যালয় হইতে ছুটিয়া গিয়া জর্ডানের জল মাথায় দিবার জন্য পাদ্রীজীর পদসেবা করে, সেও কি কতকটা ভালবাসার দায়ে পড়িয়া নয়? খৃষ্টান পাদ্রীরা অনেক স্থলেই ছেলে ভুলাইবার জন্য ভজনালয়ে—গির্জ্জাসরোবরে আধফুটন্ত শ্বেতপদ্মিনী রোপণ করিয়া রাখেন, এ কলঙ্ক ত, অনেকবার তাঁহাদের নামে রটিয়াছে। ভাল-বাসার কি প্রলোভন! ভালবাসার মত শত্রু জগতে আর কেহ আছে কি? কত ভালমানুষ ভালবাসার দৌরাত্ম্যে অধঃপাতে গিয়াছে, কত দেবতা পিশাচ হইয়া গিয়াছে, কত সাধু মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছে। এমন শত্রু, এমন রোগ বিশ্বচরাচরে আর নাই।

এমন যে শত্রু, ইহার বিনাশ জন্য,—এমন যে রোগ, ইহার প্রতিকার জন্য,—দেশশুদ্ধ লোক লাগিয়া চেষ্টা করা উচিত নয় কি? সমাজ বল, সভাসমিতি বল, সকলেরই উঠিয়া পড়িয়া পাপ-রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া চাই। ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞানসভা, জমীদারদের বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সভা, প্রজাপুঞ্জের ভারতসভা, নবপ্রতিষ্ঠিত

জমীদারপঞ্চায়ৎ, আর হরিসভা ব্রাহ্মসভা, সকল সভাতেই ইহার উপায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। আত্ম-শাসনের মিউনিসিপালিটি, স্থানীয় বোর্ড ও জেলা বোর্ডের হাতে ভালবাসা-বিনাশের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। কংগ্রেসে এই বিষয়ের বিশিষ্টরূপ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। শশধর ও কৃষ্ণপ্রসন্ন প্রভৃতি প্রচারক, বঙ্গবাসী ও সঞ্জীবনী প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং শিবনাথ ও মালাবরী প্রভৃতি সংস্কারক, সকলেই কণ্ঠে-কলমে ভালবাসা বিনাশের জন্য কৃতসঙ্কল্প হউন। বাঙ্গালী বক্তা সুরেন্দ্রনাথ, বোম্বাই বক্তা দাদাভাই, উত্তর পশ্চিমের যবন বক্তা সৈয়দ আমীর, এবং গোহত্যার বক্তা মাদ্রাজী শ্রীমান স্বামী, ভালবাসার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিতে থাকুন। স্বামীজী গোহত্যার জন্য এতটা গা ঘামাইযাছেন, আর নরহত্যার জন্য একটুও পরিশ্রম করিবেন না কি?

আর কেহ কিছু না করুন, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কদাচই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। প্রজারক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট আইন করুন, যে ভালবাসার চর্চ্চায় যে থাকিবে, ভালবাসার নাম যে মুখে আনিবে, আর মুশে গোঁকোর মত ভালবাসার উন্নতিকল্পে যে যত্নবান হইবে, তাহাকে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে। কিন্তু কেবল আইন করিলেই চলিবে না। ভাল বাসার ঔষধ চাই, ভালবাসার চিকিৎসা চাই। প্রণয়ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদিগের জন্য স্বতন্ত্র একটি হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করা চাই। ভালবাসার ঔষধ যে আবিষ্কার করিবে, গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য কোটি মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করুন।

সর্পবিষের ঔষধ জন্য যদি লক্ষ টাকার বরাদ্দ থাকে, তবে ভালবাসার জন্য কোটি মুদ্রা অবশ্যই ব্যয়িত হইতে পারে। ভালবাসার বিষ সাপের বিষ অপেক্ষাও যে তীব্র তেজস্কর, সেবিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর সর্পাঘাতের তালিকা সঞ্চয় করিয়া থাকেন, এখন একবার প্রণয়াঘাতের তালিকা সংগ্রহ করিয়া দেখুন, তুলনায় কোন্‌টা ভারী হয়। জগতে যত প্রকার ব্যাধি আছে, ভালবাসা তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও ভয়াবহ। অন্যান্য রোগে জীবের শরীরমাত্র ধ্বংস করে, ভালবাসা লোকের প্রাণে গিয়া আঘাত করে! দেহত্যাগ হইলে অন্যান্য ব্যাধির সহিত সম্বন্ধ ফুরায়, কিন্তু ভালবাসা সহমৃতা দয়িতার মত পরলোকেও আত্মার অনুসরণ করে। কবি বলিয়াছেন—

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গঢ়ল কে॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা॥

কি বিষম বিভীষিকা! এ কথা যদি সত্য হয়, তবে মরণেও ত নিস্তার নাই। অতএব এমন শত্রুকে সমূলে সংহার করিবার জন্য সমগ্র সমাজের সচেষ্ট হওয়া সহস্রবার সমুচিত, তাহাতে অবে সন্দেহ নাই। ভালবাসা নির্ম্মূল করিতে হইলে ভালবাসার দেবতা কন্দর্পের প্রতিও দণ্ডবিধান

করিতে হয়। মহামান্য মহাদেব মদন মহাশয়কে ভস্ম করিয়া ভালই করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি নাকি ভোলা ভূতনাথ, তাই দয়া করিয়া দেবতাগণের সুপারিশে আবার তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া দিলেন। তদবধি মদনদেব অনঙ্গ হইয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আবার ত্রিভুবনে বিচরণ করিতেছেন। এখন দেশের লোক, দশে মিলিয়া ঐ দুরন্ত দেবতার নামে গবর্ণমেণ্টে অভিযোগ করুক। গবর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ডবিধি অনুসারে কন্দর্পের দণ্ডবিধান করন। তবে আসামী ধরার পক্ষে একটু ধ্বস্তাধ্বস্তী করিতে হইবে। নানাসাহেব বা তান্তীয়া ভীলকে গ্রেপ্তার করা অপেক্ষা কন্দর্পকে কায়দা করা আরও কঠিন হইবে। অনঙ্গের অঙ্গ নাই, সে এখন নিরাকার। কিন্তু এক কাজ করিলেই চলিবে। নিরাকারের ধারণায় ব্রাহ্মসম্প্রদায় যেমন সুদক্ষ, এমন আর কেহই নহে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মপুলিশ গঠিত করিয়া, মদনবন্ধনের অধিকার তাঁহাদের হাতেই সমর্পণ করুন। তাহা হইলেই সকল আপদ চুকিয়া যায়। বোধ করি, সভ্যগণ সকলেই আমার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার মহাশয়ের বক্তৃতা সমাপ্ত হইবামাত্র, বন্ধু শিশির-কুমার বিশাল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, খর্ব্বাকৃত ক্ষুদ্রদেহ গর্ব্বভরে ফুলাইয়া, ক্রোধবিকম্পিত স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

সভ্যগণ ! ভালবাসাকে এত ভয় করিবার কারণ কিছুমাত্র নাই। বার বার তিন বার দেখিলাম, তিন তিনবার ভালবাসার ভোগ ভুগিলাম, তিনবারেই ভালবাসার কিছু সার শিখিবার চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু আমি যা জানি, আমি যা বুঝি, তদপেক্ষা আর কিছু সার, এ তিনবারেই ত খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনজন শিক্ষকই ভালবাসার বিভীষিকা দেখাইলেন, ভালবাসাকে একটা উচঁ দরের জিনিস বলিয়া, একটা জিনিসের মত জিনিস বলিয়া, প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। যিনি যাহা করুন, যিনি যাহাই বলুন, আমার মনে মনে যে ধারণা আছে, কিছুতেই তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। অতএব, আমার জ্ঞানমত, আমার বিশ্বাসমত, আমার শিক্ষামত ভালবাসার ব্যাখ্যা আমি আপনাদিগের সমক্ষে প্রচার করিব।

ভালবাসা বলিয়া একটা জিনিস জগতে আছে, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু উহা এত অসার, এত সামান্য, এত তুচ্ছ, যে উহাকে ভয় করা দূরে থাকুক, উহার দ্বারা কোন প্রকারে মানুষের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় বলিয়া বুদ্ধিমানে

বিশ্বাস করে না। যে নির্ব্বোধ, যে পাগল, যে আপনার স্বার্থ বুঝে না, সেই ভালবাসাকে ভয় করে। ভালবাসা কবির খেয়াল, পাগলের প্রলাপ, পাষণ্ডের ভণ্ডামীমাত্র। ভালবাসা কাব্যে পড়, ভাল লাগিবে; টপ্পায় গাও, মজলিশ্ গরম হইবে; কিন্তু কর্ম্মস্থানে—ব্যবসার ক্ষেত্রের, ভালবাসায় মজিলে সব মাটি—তুমি মাটি তোমার কর্ম্ম মাটি, তোমার আশা ভরসা সব মাটি হইয়া যাইবে।

ভালবাসা শব্দটা একটা বৃথা বাজে হুজুগ্ মাত্র। আসল কথা, ভাল কেহ কাহাকেই বাসেনা। এই যে ভালবাসার এত আন্দোলন, এত বিভীষিকা, এত রোদন, এত দীর্ঘশ্বাস, এত "মরি মরি" এত "ধর ধর," এ সকলই ফাঁকা আওয়াজ, পাকা জুয়াচুরী। পৃথিবীর সার জিনিস স্বার্থ। জগতের আর যা কিছু, সকলই এই স্বার্থের অধীন। ভালবাসাও সহস্রবার বলিব, স্বার্থের অধীন নয় ত কি? তোমায় ভালবাসিয়া আমার স্বার্থ সাধনের আশা থাকে, তবেই তোমায় ভাল বাসিতে পারি, নতুবা কথনই নহে। তুমি আমায় ভাত কাপড় দাও, অতত্রব তোমায় ভাল বাসি। তুমি আমায় হার বাজু দাও, চেন্ চুড়ী পরাও, চারি ঘোড়ায় চড়াও, খাট্ পালঙ্কে শোয়াও, অতএব তোমায় ভাল বাসি। তুমি আমায় স্বতন্ত্র বাড়ী কিনিয়া দাও, আমার নামে কোম্পানীর কাগজ কর, আমার নামে বিষয় বন্ধক রাখ, অতএব আমি তোমায় ভাল বাসিতে বাধ্য। তোমায় ভাল বাসিলে আমার গৌরব আছে, অতএব তোমায় ভাল বাসি। তোমায় ভাল বাসিলে আমার লাভ আছে, অতএব তোমায়

ভালবাসি। তোমায় ভালবাসিলে আমায় লোকে ভাল-বাসিবে, অতএব তোমায় ভালবাসি। তোমায় ভালবাসিলে সর্ব্বপ্রকারে আমার ভাল হইবে, অতএব তোমায় ভাল না বাসিলে আমার চলে কৈ?

ভালবাসার নানা কারণ, নানা মূর্ত্তি। তুমি আমায় ডালি দাও, তোমায় ভালবাসিব না কেন? তুমি আমার খোসামোদ কর—খোসনাম কর, তোমায় ভালবাসিব না কেন? তুমি আমার পাতে খাও, তোমায় ভালবাসিব না কেন? তুমি আমার পদলেহন কর, তোমায় ভালবাসিব না কেন? তুমি কুকুর হও—বানর হও, তোমায় পুষিয়াছি, সুতরাং ভাল-বাসি বৈ কি! তুমি আমার পোষা পাখী, যে বুলি বলাই, তাই বল, তোমায় ভালবাসি বৈ কি! তুমি আমার সাধের বিড়াল নন্দদুলাল, তোমায় ভালবাসি বৈ কি! আবার তুমি আমার দুষ্কর্ম্মের সহায়, আমার পাপের প্রশ্রয়দাতা, আমার নরকের সঙ্গী, সুতরাং তোমায় প্রাণেপ্রাণে ভালবাসিবই ত।

ভালবাসা নানা রকমে হইতে পারে। তুমি আমার দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা, কাজেই তোমায় ভালবাসি। তোমায় আঁটিয়া উঠিতে পারি না, কাজেই তোমায় ভালবাসি। তুমি মুষলধারী, কাজেই তোমায় ভালবাসি। গুঁতা খাইয়া আমি থাকি ভাল, কাজেই তোমায় ভালবাসি। ভাল কথায় আমি কেহ নয়, তুমি দুষমন্,—কাজেই তোমায় ভাল-বাসি। তুমি দুর্দ্দান্ত দস্যু, তোমায় ভাল না বাসিয়া করি কি? তুমি দুরন্ত রাজা, তোমায় ভালবাসিবে না এমন কাঁচা মাথা কার আছে? তুমি সিপাহী সাহেব, এস তোমায় সেলাম

করি। তুমি পেয়াদা বাবা, সচ্ছন্দে মল ত্যাগ কর। তুমি পেনাল্‌কোড্, তোমার পায়ে প্রণাম করি। তুমি পুলিস প্রভু, এস তোমার মুখে মণ্ডা দিই। তুমি গোরাচাঁদ! তোমার জুতার গুঁতা গায়ে পাতিয়া কত সাধে গ্রহণ করি;—তোমায় যে বড় ভালবাসি।

ভালবাসা যে কারণেই হউক, যে রকমের ভালবাসাই হউক, কোন ভালবাসাকেই ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। শেষোক্ত যে ভালবাসা, তাহা ভয়ে ভালবাসা হইলেও, ভালবাসাকে ভয় খাইবার দরকার নাই। ভয় কেবল ভালবাসার পাত্রকে, ভালবাসাকে আবার ভয় কি? ভয়ের কারণ যে দিন ঘুচিবে, ভালবাসাও আমার সেই দিন টুটিবে। দণ্ডধরের হাতের দণ্ড যে দিন খসিবে, সেই দিনই আমি তাহার মাথায় লাঠি মারিব। সে আমায় বাগে পাইয়া এতদিন শাসাইয়া রাখিয়াছিল, এতদিন তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম; কিন্তু আমি যে দিন তাহাকে বাগে পাইব, সেই দিন তাহার প্রতিশোধ দিব, সেই দিন তাহাকে উল্‌টিয়া ছোব্‌লাইব। ভয়ে ভালবাসা কত দিন থাকে বল? মুসলমান যত দিন রাজা ছিলেন, তত দিন মুসলমানকে ভালবাসিয়াছি। যবন-সূর্য্য পলাশীর ক্ষেত্রে পশ্চিমাচলে গেলেন, তদবধি ইংরেজকে ভালবাসি। এখন ইংরেজ যদি ভয়ে ভালবাসাইতে চান, এ ভালবাসা কি চিরদিন থাকিবে? অতএব এ ভালবাসাকে ভয় করিবার কোন প্রয়োজনই নাই।

অন্যান্য ভালবাসার ত কথাই নাই। তুমি অন্নদাতা,—যে দিন হইতে অন্নদান বন্ধ করিয়াছ, আর তোমায় ভাল-

বাসিব কেন? তোমার বাড়ী ভিক্ষা করিয়া পেট চালাইতাম,—যে দিন হইতে ভিক্ষা বন্ধ করিয়াছ, কেন তোমায় আর ভালবাসিব? তোমার সময় যখন ভাল ছিল, তখন তোমায় ভালবাসিয়াছি, এখন কি সোহাগে আর ভালবাসি? দশ টাকা দিয়া তুমি যখন খুসী করিয়াছ, তখন তোমায় ভালবাসিয়াছি; এখন তোমার হাতখালি, কোন্ প্রাণে আর ভালবাসি? গায়ে পাঁচখানা দিয়া যখন গরব বাড়াইয়াছ, তখন তোমায় ভালবাসিয়াছি, এখন হাত বন্ধ করিয়াছ, কি খাইয়া কি পরিয়া তোমায় ভালবাসি? তোমার চাকুরীটি ছিল, তবু লোকে বলিত তুমি চাকুরে পুরুষ; তখন আমায় বেশী কিছু দাও না দাও, তবু সেই খাতিরে তোমায় ভালবাসিয়াছি; এখন চাকুরী গেল, নাম ডাকও গেল, এখন আর তোমায় ভালবাসিলে লোকে বলিবে কি? খাজা মিঠাই না খাইলে, সোনাদানা গায়ে না দিলে, বোম্বাই বারাণসী না পরিলে, শুধু পেটে, শুধু গায়ে কখনও কি ভালবাসিতে পারা যায়? না কি শাক ভাত খাইয়া, বিলাতী কাপড় পরিয়া, চালা ঘরের তক্তাপোষে শুইয়া, ভালবাসার ভাব মনে আসিতে পারে? আতর গোলাবের গন্ধ ছুটিবে, সারান পমেটমে বাক্স বোঝাই হইবে, ল্যাভেণ্ডার ওডিকলমের ছড়াছড়ি হইবে, শেরি শ্যাম্পেনের কাক্ ছুটিবে, ফ্লুট পিয়ানোর ঝঙ্কার উঠিবে, ঢোলক তবলায় চাটি পড়িবে, বেহাগ খাম্বাজের তান ছুটিবে, বেল বকুলের মালা দুলিবে, যুঁই গোলাবের তোড়া ফুটিবে, তবে ত ভালবাসার আমেজ আসিবে, পিরীতের নেশায় জমাট বাঁধিবে। নহিলে কেবল

শুধু হাতে সোহাগ করিয়া ভালবাসিতে আসিলে, কাজে কাজেই বিরক্ত হইয়া বলিতে হয়,—

ভালবাসিনাকো যায়।
সে কেন সতত এসে ভালবাসা জানায়?

কিন্তু সংসার মূর্খধাম! মূর্খের সংখ্যাই এখানে অধিক। এমন মূর্খ অনেক আছে যে শুধু হাতেই ভালবাসিতে আসে। আবার এমন বোকাও আছে যে, মনে করে আমি একদিন ত রাজা ছিলাম, আজ ফকির হইয়াছি বলিয়া কি আমার মান খাতির গিয়াছে? অন্যের কথা কি বলিব, রামের ভাই লক্ষ্মণও এইরূপ বোকা-হট্‌কা ছিলেন। অদৃষ্টদোষে, রামচন্দ্রকে রাজ্যত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতে হইল। বন-গমন কালে, তিনি ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে এক দিন আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ঋষি সামান্য ফলমূলে রাজপুত্রের আতিথ্য সৎকার করিলেন। সেই রাম যখন লঙ্কা জয় করিয়া, লঙ্কেশ্বরকে সবংশে ধ্বংস করিয়া, সসৈন্যে গৃহ প্রতিগমন করিতেছেন, তখনও সেই ভরদ্বাজের আশ্রমে এক দিন অবস্থিতি করিলেন। কিন্তু ঋষি তখন চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি উপাদেয় রাজভোগে সানুচর রামচন্দ্রের সম্মান রক্ষা করিলেন। দেখিয়া লক্ষ্মণঠাকুর রাগিয়া লাল। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে, ফলমূল খাওয়ার কথাটা তাঁহার মনে ছিল। লক্ষ্মণের রাগ দেখিয়া এক জন ঋষি তাঁহাকে বুঝা-ইয়া দিলেন—

অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ ন শরীরং শরীরিণাং।
তদা বনচরো রাম ইদানীং নৃপতাং গতঃ॥

দেহীর দেহ পূজনীয় নয়, অবস্থাই পূজনীয়। রামের দেহ তখনও যা ছিল, এখনও তাই আছে, কিন্তু উহাঁর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন ইনি বনচারী ছিলেন, এখন রাজা হইতে যাইতেছেন। সুতরাং তখনকার ব্যবস্থা ফলমূল, এখনকার বন্দোবস্ত রাজভোগ হইবে না ত কি?

ঋষিতপস্বীর ব্যবস্থাই যখন এইরূপ, তখন আর লোকালয়ের কথা কি বলিব? কথাটা কিন্তু ঠিক। বাস্তবিক ভালবাসার নিয়মই এইরূপ। তোমার হাতে যখন পয়সা ছিল, তখন কত সাধ করিয়া ছানা মাখম্ তোমার মুখে তুলিয়া দিয়াছি। আর এখন শুধু-হাত নাড়া দিয়া ভালবাসা জানাইতে এস; ইচ্ছা করে, উনুনের পাঁশ তোমার মুখে গুঁজিয়া দিই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংসারে বোকার ভাগই বেশী, রামায়ণেও বোকার অভাব নাই। লক্ষ্মণ নীরেট বোকা বটে। নহিলে, শুধু শুধু ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা জানাইয়া চৌদ্দ বৎসর বনে বনে বেড়াইতে যাইবে কেন? সে বোকামীর ফল চৌদ্দ বৎসর অনাহার, অবশেষে রাবণের হাতে মর্ম্মঘাতী শক্তিশেলপ্রহার। জনকনন্দিনী সীতার মত বোকা মেয়েও ভূতলে আর দেখা যায় না। স্বামী সর্ব্বস্ব হারাইয়া বনে গেলেন, আবার তাঁহার অনুগমন করা কেন, আবার তাঁহাকে ভালবাসা কেন? এ কোন্ দেশী ভালবাসা? ইহারই নাম নিরর্থক ভালবাসা? স্বামীর সঙ্গে রত্নসিংহাসনে আরোহণ কর, সবাই আদর করিবে, সবাই ভাল বলিবে। কিন্তু স্বামী যখন বাকল পরিয়া

বনে গেল, তখনও আবার তাহাকে ভালবাসিতে গেলে উহাকে নিরর্থক ভালবাসা বলিব না ত আর কি বলিব? এ নিরর্থক ভালবাসার ফলও সীতা হাতে হাতে পাইলেন; দশানন আসিয়া কেশে ধরিয়া হরণ করিয়া লইয়া গেল, তার পর অনেক কষ্টে যদি উদ্ধার হইলেন ত দিনকতক মাত্র সিংহাসন ভোগ করিয়া, দিনকতক মাত্র রামের বামে বসিয়া, আবার সেই রাম কর্ত্তৃকই বন-বাসে বিদূরিত হইলেন। সীতাসুন্দরী বোকার বেহদ্দ নয় ত কি? বানররাজ-মহিষী তারা, সীতার অপেক্ষা শত গুণে বুদ্ধিমতী ছিলেন। বালিবিয়োগে যেমন বৈধব্য ঘটিল, অমনি তিনি সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইলেন। রাক্ষসরাজ-মহিষী মন্দোদরীর ত কথাই নাই। পতি গেল পুত্র গেল, পুরী গেল বংশ গেল, তবু তিনি ঠকিলেন না। দেবর বিভীষণের বামে বসিয়া সচ্ছন্দে আবার রাজত্ব ভোগ করিতে লাগি-লেন। ভালবাসা বজায় রহিল, স্বার্থও বজায় রহিল। ইহা-রই নাম সার্থক ভালবাসা। সার্থক ভালবাসার অর্থ যাহারা বুঝে, তাহারাই শেয়ানা লোক, কাব্যের নায়ক নায়িকা হই-বার উপযুক্ত পাত্র তাহারাই। বাল্মীকির বোকামি যে তিনি ঠিক বিপরীত করিয়া বসিয়াছেন। তারা মন্দোদরীকে রামায়ণের নায়িকা না করিয়া জনক রাজার ন্যাকা মেয়েকে নায়িকাপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দেশের লোক কিন্তু বাল্মীকির বোকামীতে ভুলে নাই। তারা মন্দোদরীর সঙ্গে সঙ্গে আর তিন জন শেয়ানা মেয়েকে বাছিয়া বাছিয়া তাহারা প্রাতঃস্মরণীয়া বলিয়া গণ্য করিয়া রাখিয়াছে—

অহল্যা দ্রৌপদী তারা কুন্তী মন্দোদরীতথা।
পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যাং মহাপাতকনাশনং॥

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তও ঠিক ধরিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রামের দল বল অপেক্ষা, লঙ্কার দলই সভ্যভব্য ও শেয়ানা ছিল। কোন বন্ধুকে চিঠি লিখিয়া এই মত তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক ইন্দ্রজিৎ, প্রতিনায়ক লক্ষ্মণ। স্বয়ং রামচন্দ্র এই কাব্যে নেড়ীমারা ভিখারী ভ্যাবাগঙ্গারামরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। মাইকেল বিলাতফেরৎ বারিষ্টার, তাঁহার বিদ্যা অসীম! মেঘনাদবধ মহাকাব্য।

বাস্তবিক বিলাত বেড়াইয়া না আসিলে বুদ্ধি চিক্কণ হয় না। এক জন বিলাতফেরৎ বাঙ্গালী বারিষ্টারের দৃষ্টান্ত দেখুন। বারিষ্টার বাবু—শ্রীবিষ্ণু, বারিষ্টার সাহেব, বড় রোখা পুরুষ। কোন জেলার সদরালার এজলাসে তিনি একদিন সাক্ষীর জেরা করিতেছিলেন। সাক্ষী এ দেশের একজন বিখ্যাত ধনীসন্তান, শিষ্ট শান্ত ও সদাচারী বলিয়া তাঁহাকে সবাই জানে। বারিষ্টার আজ তাঁহাকে বাগে পাইয়াছেন, ছাড়িবেন কেন? বারিষ্টার আজ তাঁহার প্রতিপক্ষের কৌঁসুলী। কিন্তু ঠিক্ ইহার পূর্ব্ব দিন, ইনি ইহাঁর পয়সা খাইয়া, ইহাঁর যশোগান গাহিয়াছিলেন। আজ সে বারিষ্টারের সে মূর্ত্তি আর নাই। আজ তাঁহার জেরার জাঁক দেখে কে? পলকে পলকে আস্তীন গুটাইতেছেন, তালে তালে টেবিলে তাল ঠুকিতেছেন, আর পদে পদে ক্ষিতিতলে পদাঘাত করিয়া, পাকা চালে শওয়ালের উপর শওয়াল

চালাইতেছেন। স্বয়ং বিচারপতি জেরার জুলুম দেখিয়া একটু বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, "বারিষ্টার সাহেব! শওয়াল কি ঐ রকমেই করিতে হয়?" বিচারপতি খাঁটী বাঙ্গালী; কাজেই, কাজের কথা তিনি তত বুঝেন না, নিষ্কারণে দয়া দেখাইতে, নিরর্থক ভালবাসিতে বোকা লোকে বড় মজবুৎ। বিলাতঘেঁাটা বারিষ্টার অবশ্য সে কথায় ভুলিলেন না, অধিক কি, কর্ণপাতও করিলেন না! তাঁহার জেরার জোয়ার অনিবার ছুটিল। সাক্ষী সম্ভ্রান্ত লোক, এরূপ কষ্টে, এরূপ অপমানে অনভ্যস্ত। দশটার সময় দুটি ভাত মুখে দিয়া কাট্‌রায় ঢুকিয়াছেন, বেলা যখন প্রায় পাঁচটা বাজে, তখন হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিল, আর দাঁড়াইতে পারেন না। বোকা বিচারক গতিক দেখিয়া আবার দয়া করিতে গেলেন, সাক্ষীকে কাট্‌রায় বসিবার জন্য চেয়ার দিতে বলিলেন। চেয়ারের নাম শুনিয়া, বারিষ্টার ভ্রুকুটিভঙ্গে হুঙ্কার করিয়া মাথা নাড়া দিলেন। বিচারক হতভম্ব, চাপরাশী চেয়ার মাথায় করিয়া ফিরিয়া গেল। সাক্ষীর চক্ষু তখন ছল ছল করিয়া আসিল। অবসন্ন দেহে, কাট্‌রা ধরিয়া কথঞ্চিৎ দাঁড়াইয়া, কাতরকটাক্ষে বারিষ্টারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মুখে কথা ফুটিল না, কিন্তু স্পষ্টই বোধ হইল যে, মনে মনে বুঝি বলিতেছেন—"বাপু! কাল তোমায় মোহর দিয়া এত মান বাড়াইয়াছি, আর আজ যে তুমি আমায় এত অপমান করিতেছ, ইহাতে তোমার একটু দয়া, একটু চক্ষুলজ্জা বোধ হইতেছে না কি?" বুদ্ধিমান বারিষ্টার সে নীরব-নিবেদনের মর্ম্ম বুঝিলেন। বুঝিয়া এক কথায়, তখনি

সে বোকা সাক্ষীর চট্‌কা ভাঙ্গিয়া দিলেন। বারিষ্টারের সেই বেদবাণী, আমার কাণের উপর এখনও যেন ঝঙ্কার করিতেছে—

"টুমি হেমন মনে করিও না যে হামি কাল টোমার পয়সা খাইয়াছে বলিয়া, আজ টোমায় রেয়াট্ কর্‌বে।"

কথাটা বাস্তবিক বেদবাক্যই বটে। ভালবাসিতে যে চায়, সে এই মহাবাক্যের মর্ম্ম যেন কদাচ না ভুলে। এই বারিষ্টারকে অনেকে গোঁয়ার-গোবিন্দ বলিয়া, চোয়াড়-চরিত্র বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে; কিন্তু আমার তিনি পরমগুরু, তাঁহার পায়ে শত সহস্র প্রণাম করি। বারিষ্টার যে দিন তাঁহার মক্কেলের টাকা খাইয়াছিলেন, সে দিন তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু পর দিন সে মক্কেল আর কে? সেদিন তাহার মাথায় ঝাড়ু মারিয়া যদি কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহাতে পিছাইতে আছে কি? যতক্ষণ পয়সা, ততক্ষণ আদর; যতক্ষণ রবি, ততক্ষণ রৌদ্র; যখনি নিশা, তখনি অন্ধকার। ভালবাস, কিন্তু কাজ ভুলিও না। যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ ভালবাসিও। যে দণ্ডে কাজ ফুরাইবে, সেই দণ্ডেই ভালবাসার জাল গুটাইয়া লইবে। ভালবাসার পাত্র, বিবাহের ছাঁদ্‌লাতলা; কাজ ফুরাইল, অম্‌নি মার লাথি, আর কথায় কাজ কি? ভালবাসার দায়ে যে কাজ ভুলে, তাহার মত নির্ব্বোধ আর আছে কি?

ভালবাসাকে আবার ভয় কি? ভালবাসা আমার স্বার্থের অধীন, ভালবাসা আমার প্রয়োজনাধীন। এমন যদি কোন ভালবাসা থাকে যে, আমার কোন প্রয়োজন তাহার কাছে

নাই, কোন উপকারের প্রত্যাশা তাহার কাছে নাই, তবু তাহাকে ভাল বাসিতে হইবে, তবে সে ভালবাসাকে ভয় খাইতে হয় বটে। ভালবাসা যদি এমন হয় যে আমার আবশ্যক হইলেও ত্যাগ করিতে পারি না, সে আমায় ত্যাগ করিয়াছে তবু তাহার মায়া ছাড়িতে পারি না, সে পর হইয়াছে তবু তাহাকে পর ভাবিতে পারি না, সে পরলোকে গিয়াছে তবু অপরকে প্রাণ সঁপিতে পারি না, অধিক কি সে আমার শত্রুতা করিতেছে, তবু তাহার মিত্রতা করিবার জন্যই আমার চিত্ত সতত ব্যাকুল থাকে, তবে সে ভালবাসা বড় ভয়ানক, বড় বিস্ময়কর।

কিন্তু এরূপ ভালবাসার অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না। এমন ভাল যে কেহ বাসিতে পারে, এ কথা আমার চিত্তে ধারণাই হয় না। পাগল ভিন্ন, অমানুষ ভিন্ন, এমন ভালবাসা কেহ বাসে না। ভালবাসার চরণে আপনার স্বার্থ যে বলিদান করে, সে বাস্তবিক অপদার্থ। আমার শিক্ষা অন্যরূপ; অমার 'গুরু আমায় শিখাইয়াছেন যে, ভালবাস, কিন্তু সাবধান! তোমার প্রাণে যেন কাঁটার আঁচড় লাগে না; ভালবাস, কিন্তু তোমার মনের লাগাম তোমার হাতে রাখিও। আর শিখাইয়াছেন যে, স্বার্থসাধন জন্য, কার্য্যোদ্ধার জন্য যদি পিশাচকে ভালবাসিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইও না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অতঃপর রসিকরঞ্জন ভায়া, গোপালে উড়ের দলের মত হাতে হাততালি দিয়া বক্তৃতার সুর ধরিয়া ফেলিলেন—

শুন ভাই রে!

তোমরা যে যাহাই বল, ভালবাসা বড় ভাল জিনিস। জগতে যত কিছু ভাল জিনিস আছে, ভালবাসা সে সকলেরই সহিত তুল্যমূল্য। ভালবাসা বড় বাজারের রাতাবি মণ্ডা; মুখে দাও অমনি গিলাইয়া যাইবে। কিন্তু অধিক খাইও না, অম্বল হইবে; অধিক খাইও না, গলায় জড়াইয়া ধরিবে। ভালবাসা বাগ্‌বাজারের রসগোল্লা; রসে ঢল ঢল, বর্ণে গোলাবের গর্ব্বহরা। কামড় মার, বুক বহিয়া রসের ধারা ছুটিবে। ভালবাসা ক্ষীরের বর্‌ফি। দুধের সার ক্ষীর, মিষ্টের সার চিনি, সেই ক্ষীর-চিনির অপূর্ব্ব সমাবেশ। ভালবাসা কৃষ্ণনগরের সরভাজা; একে দুধের সর, তায় ঘিয়ে ভাজা, তায় আবার রসের পাক, এর বাড়া মজা আর কি আছে? ভালবাসা বর্দ্ধমানের মিহিদানা। দানা যার আছে সেই ত সার সামগ্রী। ভালবাসা ধনেখালীর খইচুর, অন্দের ভিতর কম কারখানা নয়। ভালবাসা খাস্তার কচুরী, তয়ে তয়ে মুখে তুলিও, ধরিতে যেন গুঁড়াইয়া না যায়। ভালবাসা ময়ান-দেওয়া ফুল্কো লুচি, গোল গোল ফুলো ফুলো—যেন ভুগোলের পৃথিবী। ভালবাসারও সকলদিকেই গোল,—ঠিক্ পৃথিবীর আকার;

জাহাজ ছাড়িয়া যেদিকে যাও, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার ঠিক্ সেইখানে আসিয়াই পঁহুছিবে। আবার গ্রহণসময়ে রাহু-গ্রাসের যে ছায়া পড়ে তাহাও ঠিক্ গোল।

ভালবাসা মালাই ক্ষীর; চুমুকে পান কর, সর্ব্বশরীর জুড়াইয়া যাইবে। ভালবাসা গব্য ঘৃত, শুধু গন্ধেই অন্ন-গ্রাস ধ্বংস করা যায়। ভালবাসা রুই মাছের মুড়ো, ঘিয়ে ভরা, সার পদার্থে পরিপূর্ণ, আস্বাদে অদ্বিতীয়। ভাল-বাসা কুক্কুটমাংস, সাহেব-বাবুর রসনায় যেন সুধাবৃষ্টি। ভালবাসা গোল আলু; ঝোলে অম্বলে, ঝালে দালনায়, ভাজা পোড়ায় সকলেতেই আছেন। ভালবাসা খাসা পোলাও, মালে মশ্‌লায় দমে ভারী; কত যত্নে প্রস্তুত করিতে হয়, কত আট্‌কালে আখ্‌নীর আঁচ্ বাখিতে হয়। ভাল-বাসা ভাজা পিটে, খেতে যেমন মুখপ্রিয়, আবার হজম করিতে না পারিলে পেটের পক্ষে তেমনি অপ্রিয়। ভালবাসা ভাজা ইলিস্, সুরা ও বিসূচিকার সমান সহায়। ভালবাসা কমলা লেবু;—গাছপাকা হইলে সুমধুর, কাঁচায় পাকিলে টকে প্রাণ জ্বালাতন। তবে যদি মাঝামাঝি গোছের, অর্থাৎ অম্লমধুর হয়, তাহা হইলেও শুধু চলে না, লবণের সাহায্য লইতে হয়। নিমক্ খাইলে কে না বাধ্য হয় বল? ভাল-বাসা পরমান্ন, দুধে ভাতে মিষ্ট-যোগ, ইহার বাড়া আছে কি? ভালবাসা ক্ষীরের কুল্পী, সেবনে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়। ভালবাসা ফলের রাজা ফজ্‌লী আম, আঁটি পর্য্যন্ত চুসিয়া খাও, টকের লেশমাত্র নাই। ভালবাসা খাসা খাম্বীর, টানে টানে প্রাণ অস্থির। ভালবাসা নেসার রাজা, এক্কা

নম্বর এক ; যখন চমৃচমিয়া ধরে, তখন মাথার উপর চৌদ্দ-ভুবন ঘুরিতে থাকে। ভালবাসা লক্ষ্ণৌয়ের মিঠা খিলি—এখনও টাকায় একটা।

সভ্যগণ! কেবল খাদ্যদ্রব্যের সহিত ভালবাসার তুলনা করিতেছি বলিয়া, আমাকে নিতান্ত পেট্‌পাগল বলিয়া স্থির করিবেন না। আমার পেট আছে স্বীকার করি, সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার উপর—উদরের শিরোভাগে, বুক্‌টা আছে বলিয়াও জানিবেন। আমি যেমন পেটুক্‌, তেমনি ভাবুক ; ভালবাসার সহিত আমাদের খাদ্যখাদক-সম্বন্ধ বর্ণনা করিয়াছি, এই দেখুন এখন আবার ভালবাসার মহান্‌ চিত্র মহাকৌশলে প্রতিফলিত করিব। কিন্তু কালিদাসের মত, আমার প্রধান অস্ত্র উপমা ; উপমা ছাড়িয়া আমি চলিতে বা বলিতে পারি না। ভালবাসা হিমালয় পর্ব্বত ; অচল, অটল, গগণস্পর্শী। হিমালয় ভারতব্যাপী। ভারতের উত্তরপ্রান্ত—এধার ওধার হিমালয়ে জোড়া। ভালবাসাও ভাবুকের বুক্‌জোড়া ধন। বুক্‌জোড়া বটে, বুক্‌-জুড়ানও বটে। ভালবাসায় যার বুক্‌ ভরা আছে, তার বুক্‌ তুষার-মণ্ডিত হিমগিরির মত ঠাণ্ডা নয় ত কি? গিরিগুহার স্থানে স্থানে সিংহ শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তু বাস করে, ভালবাসাতেও কি হিংসার ভয় নাই? কিন্তু এই গিরিকন্দরেই আবার ঋষি তপস্বীর পুণ্যাশ্রম। ভালবাসাও ত ভাই! পবিত্র তপোবন। এমন তপস্যা, এমন ত্যাগস্বীকার, এমন যোগসাধন আর কিসে আছে বল?

হিমাচল ভারতের গৌরব-ধ্বজা ; ভালবাসাও আমি বলি,

ভারতের গৌরব-নিশান। ভালবাসা একদিন ভারতই বুঝিত, ভারতই জানিত। ভাই কেমন করিয়া ভাইকে ভালবাসে, সন্তান কেমন করিয়া পিতা মাতাকে ভালবাসে, সতী কেমন করিয়া পতিকে ভালবাসে, সাধক কেমন করিয়া দেবতাকে ভালবাসে, শিষ্য কেমন করিয়া গুরুকে ভালবাসে, রাজা কেমন করিয়া প্রজাকে ভালবাসে, প্রজা কেমন করিয়া রাজাকে ভালবাসে, গৃহস্থ কেমন করিয়া অতিথিকে ভালবাসে, মিত্র কেমন করিয়া মিত্রকে ভালবাসে, সাধু কেমন করিয়া শত্রুকেও ভালবাসে; এ সকলের আদর্শ খুঁজিতে হইলে, ভারত ভিন্ন জগতে এমন স্থান আর আছে কি? আজ ভারতের সেই অনন্ত ভালবাসা কালসাগরে ডুবিতে বসিয়াছে; এখন আছে কেবল ঐ হিমাচলের মত পাষাণের নিশানমাত্র। ভালবাসা সর্ব্বাংশেই হিমাচলের সহিত তুলনীয় বটে।

ভালবাসা সাগরসঙ্গম। যেখানে বুকে বুকে মাখামাখি, তাহার মত তীর্থ আর কি আছে? ভালবাসা প্রয়াগ তীর্থ; যিনিই হউন না কেন, সেখানে গেলে সকল মিয়াকেই মাথা মুড়াইতে হয়। ভালবাসা কুরুক্ষেত্র—ধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে অধর্ম্মের পরাজয়। ভালবাসাতেও যদি অধর্ম্ম থাকে, অবশ্যই তাহার পতন হইবে। ভালবাসা গঙ্গা নদী; সরল, তরল পবিত্র; রূপে ঢল ঢল, আবেগে কল কল। কিন্তু যখন বর্ষায় বাড়ে, তখন দুকূল ভাসাইয়া, দুরন্ত বেগে, একটানার আবেগে, আপন গোঁয়ে, সেই আপনার লক্ষ্য স্থানে অবাধে উধাও হইয়া ছুটিতে থাকে। ভালবাসা প্রবল

পন্থা ; আছে ত বেশ শান্ত, মুখে কোন কথাটি নাই। কিন্তু যখন ক্ষেপিয়া দাঁড়ায়, তখন ষ্টীমার পার পায় না, ডিঙ্গী পান্‌শী কোন্ ছার? ভালবাসা মহাসাগর; অপার, অনন্ত, অতলস্পর্শ। তিমি নক্র, হাঙ্গর কুম্ভীরের হাত এড়াইয়া, ডুব্ দিয়া যদি তলা পাইতে পার, তবে তোমার জোর কপাল; অনন্ত রত্নভাণ্ডার তোমার জন্য সাজান আছে। ভালবাসা কৈলাসপুরী, মহাশক্তির সহিত মহাযোগেশ্বরের অনন্ত যোগ-সাধন। ভালবাসা নিত্য-বৃন্দাবন,—ভক্তের বৈকুণ্ঠধাম; হ্লাদিনীর সহিত আনন্দময়ের অনন্ত লীলা।

উচুঁ হইতে আবার একবার নীচ নামিতে হইল। সরু মোটা না খেলাইলে হাতের হরফ্ খোলে না, আর উচুঁ নীচু না করিলে, চড়া খাদে না গাইলে, বক্তৃতার বাহার হয় না। ভালবাসা কি সুন্দর! সে সৌন্দর্য্য আমি সোজা কথায় কেমন বুঝাই দেখুন। ভালবাসা কোকিলের কুহুরব; হৃদয়কাননে যখন পঞ্চমের তান ছুটে, তখন সে রবে বন-ভূমি আকুল হইয়া উঠে না কি? ভালবাসা মলয় সমীরণ; ঝুর্ ঝুর্ করিয়া যখন গায়ে লাগে, শরীর যেন শিহরিয়া উঠে, হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ হইয়া যায়। ভালবাসা বেল-ফুলের সৌরভ; বসন্ত-পবন-ভরে সে সৌরভ যখন মগজে গিয়া উঠে, তখন সমগ্র দেহযন্ত্রখানা অকস্মাৎ যেন বিকল হইয়া যায়। ভালবাসা শতদল পদ্ম; দলে দলে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি—ভিতরে মধুভরা; কিন্তু মধুকর বিনা কার সাধ্য মধু বাহির করে? ভালবাসা বসন্তের নব পল্লব; নবীনে অতুল শোভা। ভালবাসা শরতের চন্দ্রিকা,

প্রাণের ভিতর যেন সুধাবৃষ্টি। ভালবাসা প্রাতঃসূর্য্যের লোহিত রাগ, কাল মেঘগুলাও তাহার রঙ্গে রাঙ্গা হইয়া যায়। ভালবাসা চৌতালের গান; তান লয়ে সঙ্গত হইয়া যখন সঙ্গীত ছুটে, ঘর সংসার যেন সেই সুরে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ভালবাসা নিধুর টপ্পা, সহস্র ধারায় যেন মধুবর্ষণ। ভালবাসা কীর্ত্তনের সুর, প্রেমে প্রাণ গদগদ। ভালবাসা গভীর নিশীথে যেন বেহাগ রাগিণী; প্রাণে লাগিলেই যেন গ্রন্থিবন্ধন সব এলাইয়া আসে, আবেগে অঙ্গ যেন ঢলিয়া পড়ে, যেন বলিতে হয় "আমায় ধর ধর।" ভালবাসা সেতারের আলাপ; তারে তারে কি মধুর ঝঙ্কার ছুটে? ভালবাসা টেলিগ্রাফের তার; বিদ্যুৎ কোথা হইতে কোথায় গিয়া যন্ত্রের কাঁটা নাড়িয়া দেয়; কিন্তু বাজ্ পড়িলেই চক্ষুস্থির। ভালবাসা কলের গাড়ী; কল টিপিলেই আপনি চলে, কল ফাটিলেই সর্ব্বনাশ। ভালবাসা আমার গৃহিণীর পায়ের চারিগাছা মল; পদে পদে যখন ঝমর্ ঝমর্ বাজে, তখন বুকের ভিতর কেমন আঘাত পড়ে বল দেখি! ভালবাসা আমার প্রিয়ার হাতের নূতন সম্মার্জ্জনী; পরীক্ষার্থ যখন আমার পিঠে পড়ে, তখন সোহাগের ধারা কি শতমুখে ছড়াইয়া পড়ে না? ভালবাসা যেন আমার ব্রাহ্মণীর মুখখানি; সদাই খর খর, কিন্তু তবু কত মিষ্টি!

আমার বক্তৃতা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু ভালবাসার গুণবর্ণনা কি ফুরাইল? তাহা মনে করিবেন না। "ন গুণানামিয়ত্তয়া।" ভালবাসার গুণবর্ণনা শেষ হইল

বলিয়া নহে, আমার বাগ্মিতা-শক্তি অবসন্ন হইয়া আসিল বলিয়াও নহে। আমি মনে করিলে এখনও ঝাড়া তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করিতে পারি। কিন্তু সভ্যবৃন্দকে আর কষ্ট দিব না বলিয়া, সভার আর সময় হরণ করিব না বলিয়াই, অগত্যা আমার বক্তৃতা শেষ করিয়া আনিতে হইল। ভালবাসার উপমা অনেকগুলি দিয়াছি; অতএব এখন "ঝাঁকা মুলাইয়া" কালিদাসের মত অনায়াসে বলিতে পারি যে, ভালবাসা মোটের উপর সেই "সর্ব্বোপমাদ্রব্য-সমুচ্চয়েন" বিনির্ম্মিতা আমার গোটা গৃহিণীখানি। গৃহিণী আমার সকল গুণের গুণমণি, ভালবাসাও আমার পক্ষে তেমনি! আমাব গৃহিণীর নাক ভাল মুখ ভাল, চোক্ ভাল কান ভাল, গড়ন ভাল পেটন ভাল, রং ভাল ঢং ভাল। ভালবাসারও সবই ভাল। মিলন ভাল বিরহ ভাল, কলহ ভাল কলঙ্ক ভাল, হাসি ভাল কান্না ভাল, আদর ভাল আঘাত ভাল। আমার গৃহিণীও যা, ভালবাসাও ঠিক তাই। আমার গৃহিণী মূর্ত্তিমান্ ভালবাসা। অতএব ভালবাসার আর স্বতন্ত্র বর্ণনা না করিয়া, আমার গৃহিণীর গুণবর্ণনা করিলেই—ভালবাসার মহিমা কীর্ত্তন করা হয়। আমার গৃহিণীর সকলই ভাল। তিনি চলেন ভাল, বলেন ভাল। তিনি চলিলে লাবণ্যের ঢেউ খেলাইতে থাকে, তিনি কথা কহিলে যেন এস্রাজ বাজে। তিনি খান ভাল, পরেন ভাল। তাঁহার আহারের পরিচয় আমি প্রসাদে যৎকিঞ্চিৎ পাই; আর তাঁহার পরিধানের পরিচয় স্বর্ণকারের তাগাদা ও দর্জ্জীর দোকানের বিলেতেই

সুপ্রকাশ। তিনি হাসেন ভাল, কাঁদেন ভাল। হাসেন আমার বোকামীতে, কাঁদেন আমার দারিদ্র্যে। তিনি রান্ধেন ভাল, নাদেন ভাল। তাঁহার পাকের পরিচয় সেই সাত পাক হইতে আজি পর্য্যন্ত নিত্যই পাইয়া থাকি, এবং তাঁহার নাদের পরিচয় আর না দিলেও চলে।

কিন্তু "নাদেন" এই কথাটা লইয়া সমালোচক মহলে একটা গোল বাধিতে পারে। আমি কি করিব? মাইকেল ইহা লইয়া গোল বড় পাকাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদ-বধ কাব্যে দেখিবেন, তাঁহার রাক্ষস ও বানরগুলা কথায় কথায় "নাদিয়া" ফেলে। যেখানেই যুদ্ধের খুব জমজমাট্, সেইখানেই "নাদিছে বানরবৃন্দ, নাদিছে রাক্ষস।" এখন, রণরঙ্গের ঘোর বিভীষিকামধ্যে, "নাদিল বানরসেনা" একথা বলিলে, বানরগুলা সভয়ে শৌচত্যাগ করিল, কি সরোষে গর্জ্জন করিল, সহজে তাহা বুঝা যায় না। রাক্ষসের বেলাও ঠিক সেই ভ্রম হয়। তেমনি আমার গৃহিণী "নাদেন ভাল" একথা বলিলেও অনেকেই ভ্রান্ত হইতে পারেন। তবেই শব্দার্থরহস্যের একটা বিষম সমস্যা পড়িয়া গেল। সুবুদ্ধি সমালোচক ভাবিয়া কূলকিনারা পাইবেন না। তিনি ব্যাকরণ হাৎড়াইবেন। ব্যাকরণে এরূপ স্থলে উপদেশ দেওয়া আছে যে স্থল বুঝিয়া, প্রয়োজন বুঝিয়া, শব্দার্থ নিরূপণ করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কথিত হইয়াছে যে, "সৈন্ধব" এই শব্দের দুইটা অর্থ আছে। সৈন্ধবের এক অর্থ লবণ, আর এক অর্থ সিন্ধুদেশজাত ঘোটকবিশেষ। এখন কেহ আহার করিতে বসিয়া যদি বলেন "সৈন্ধব আনয়ন কর," তবে অবশ্যই

লবণ দিতে হইবে। আর কাটা পোষাক পরিয়া, চাবুক হাতে করিয়া যদি বলা যায় "সৈন্ধব চাই," তবে ঘোড়া প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এ দৃষ্টান্তেও আমার "গৃহিণী নাদেন", এ কথার অর্থ কিরূপে পরিষ্কৃত হইবে? নাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বর বা গর্জ্জন, আর আধুনিক লৌকিক অর্থ বিষ্ঠা। "হাতীর নাদ, সিংহের নাদ, গাভীর নাদ," এ সকল স্থলে, নাদ শব্দ দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। "গাভী নাদিল," ইহা বলিলে দুই বুঝায়; অর্থাৎ গাভী ডাকিল, বা গাভী বিষ্ঠাত্যাগ করিল। তেমনি সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক মনে করিবেন, "আমার গৃহিণী নাদেন ভাল" একথার দুই অর্থই হইতে পারে—অর্থাৎ তাঁহার গর্জ্জন ভাল, কিম্বা তাঁহার পুরীষটুকুও উপাদেয়। প্রণয়িণীর পুরীষ অনেকেই সুমিষ্ট বলিয়া উপলব্ধি করিবেন। বিশেষতঃ রন্ধনের পরেই যখন নাদের কথাটা আছে, তখন এই অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া অনেকে অনুমান করিবেন। মুশে বোকোঁ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, এক জন ফরাসী ডাক্তার পরীক্ষার্থ বিষ্ঠার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস যে তাঁহার প্রণয়িনীর পুরীষ ভক্ষণ করিলে, ডাক্তার মহাশয়ের পরীক্ষা বিফল হইত। কেন না প্রেয়সীর পুরীষ প্রেমিকের পক্ষে চন্দনস্বরূপ, প্রেমিক এখানে পরমহংস। জননী ঔষধ দিলে যেমন ফল দর্শে না; কেন না, মা বিষ হাতে করিয়া দিলেও তাহা অমৃত হইয়া দাঁড়ায়; তেমনি কেহ কেহ বলেন, প্রেয়সার পুরীষে পুরীষত্ব থাকে না; সুতরাং তাহার আস্বাদগ্রহণে ফরাসী ডাক্তার ফল পাইবেন কেন?

এই গেল পুরীষপক্ষে। এখন অন্য পক্ষে অনেকে অর্থ করি-বেন যে, "রাঁধেন" একথার পর যখন "নাদেন" ব্যবহৃত হইয়াছে; তখন বুঝিতে হইবে যে, রসিকরঞ্জনের গৃহিণী রন্ধনে বড় নারাজ, তাই রন্ধনকালে ধূমব্যাকুলিত-লোচনে রসিকের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করেন, সে গর্জ্জন বড় সুশ্রাব্য। পক্ষান্তরে আবার, ব্রাহ্মণী রন্ধনে অশক্তা, অতএব তৎকালে তিনি কাপড়ে চোপড়ে "নাদেন" বলিয়া বিপক্ষবাদীরা তর্ক করিতে পারেন। সুতরাং দুদিকেই বড় বিষম গোল। কোন্‌টা ঠিক অর্থ আমি কিন্তু ভাঙ্গিয়া দিব না। ভবিষ্যৎ টীকাকার ও সুবুদ্ধি সমালোচকের জন্য, এটুকু—আমার ব্রাহ্মণীর এই নাদটুকু, আভাঙ্গাই রহিল।

ভালবাসা বড় ভাল, ভালবাসাকে আমি বড় ভালবাসি। আমার গৃহিণীকেও আমি তেমনি ভালবাসি। কিন্তু আমার গৃহিণীর সহিত কোন বিষয়ের তুলনা করিতে যাওয়া বড় বিপ-দের কথা। এইরূপ তুলনা লইয়া এক দিন যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহার বিবরণ দিয়া আমার এই বক্তৃতা শেষ করিব। আম্রফল আমি বড় ভালবাসি। অন্যের অপেক্ষা বোধ হয় কিছু বেশী ভালবাসি। জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার অন্নাহার বা অন্যাহার প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এক এক বেলার জল-যোগেই প্রায় পঞ্চ গণ্ডা আঁটি জড় হয়। একবার জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনে আমার বড় পেটের অসুখ হইল। ভাত বন্ধ হউক তাহাকে পারি, কিন্তু চূতবিরহ ত সহ্য করা যায় না। দুই দিন কোন মতে চোক্ কাণ বুজিয়া থাকিয়া, তিন দিনের দিন চিকিৎসককে চাপিয়া ধরিলাম। বলিলাম,

"ভুগিতে হয় না হয় ভুগিব, কিন্তু আজ অন্ততঃ একটি অম্রের আস্বাদ লইবার ব্যবস্থা অ্মাকে দিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনে একটানা অম্রের বিরহ আমার সহ্য হইবে না।" চিকিৎসক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, দয়া করিয়া আমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। কিন্তু বলিয়া দিলেন, "দেখিও, সাবধান! একটির বেশী যেন না হয়।" আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। দৌড়িয়া গিয়া, গৃহিণীর চরণে সেই সম্বাদ নিবেদন পুর্ব্বক, উমাপতি যেমন অন্নদার কাছে অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তেমৃনি করিয়া একটি অম্রফলের জন্য হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিতে বসিলাম।

গৃহিণী তখন সম্মার্জ্জনীকরে গৃহসংস্কারে নিবিষ্টা ছিলেন। আমার কথা শুনিয়া, তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণী আমার ডাক্তারের বাবা। তিনি বলিলেন, "ডাক্তার বলে বলুক, আমি কিন্তু পেটের অসুখে তোমায় আম খাইতে দিব না।" শুনিয়া আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চক্ষে জল আসিল। সজলনেত্রে, লোলুপরসনায়, গৃহপ্রান্তে রাশীকৃত রসালনিচয়ের দিকে অবিরত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। গৃহিণীর আমার একটা গুণ আছে। তিনি যেমন বারেহাঁ, এদিকে আবার তেমনি দয়াবতী। আমার কাতরতা দেখিয়া তাঁহার বিধুমুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। আমের গাদা হইতে সুপক্ক সুডৌল গোছের একটি আম বাছিয়া লইয়া তিনি বলিলেন; "আচ্ছা, এক কাজ কর। এই আম আমার হাতে রহিল, একটা কথার উত্তর তুমি আগে দাও। আম তুমি বড় ভালবাস, আমাকেও কম ভালবাস না।

কিন্তু আম ও আমি, এ দুয়ের মধ্যে কাহাকে বেশী ভালবাস এ কথার উত্তর আজ তোমায় দিতে হইবে। আমা অপেক্ষা আমকে যদি বেশী ভালবাস, তবে আম আমার সতীন হই-লেও এখনি তোমার হাতে হাতে ইহাকে সঁপিয়া দিব। আর যদি আমাকে বেশী ভালবাস, তবে আমার কথা শুন; পেটের অসুখে আজ আম খাইও না। কিন্তু 'দুই সমান' বলিলে শুনিব না, আমে ও আমায় তারতম্য করা চাই।"

আমার বিপদ আরও বাড়িয়া উঠিল। ভাবিলাম এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ত বড় সহজ ব্যাপার নয়। ঘোর সমস্যায় পড়িয়া প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বিদ্যালয়ে পঠিত জ্যামিতি বা বীজগণিতের সমস্যা ইহার তুলনায় এখন অতি সহজ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মনে মনে কত তর্কের তরঙ্গ উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম এ দুয়ের তারতম্য কেমন করিয়া করি? অনেকাংশেই দুই ত সমান বটে। বর্ণে দুই সমান; সুপক্ক সহকারটি ফিট্ গৌরবর্ণ, সহধর্ম্মি-ণীও আমার নিখুঁত গৌরাঙ্গী। আস্বাদে দুই মধুর; তবে আঁটির ভিতর, কেসুরের তিক্তস্বাদ উভয়েরই আছে। আর রসের কথা বলিতে গেলে, দুয়ে আড়াআড়ি নয় ত কি? রসাল যেমন রসে ভরা, রসিকরঞ্জনের রসবতীও কোন্ রসে মরা? তবে এখন উচ্চ আসন কাহাকে দেওয়া যায়? হনূমানের আনীত এই রসাল ফল; আর আমার আনীতা, আমার পরিণীতা, আমার প্রতিষ্ঠিতা এই রসবতী যুবতী, এ দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? শ্রেষ্ঠ যেই হউক, আপাততঃ কি বলিলে আমটি হাতে পাই, অথচ ব্রাহ্মণীও হাত-ছাড়া না হন।

হাঁত-ছাড়া নাই হউন; কিন্তু আমের দিকে টানিয়া বলিলে, ঐ যে মুড়ো-ঝাঁটা-মণ্ডিত ঐ হাতখানি—ঐ সশস্ত্র হাতখানি যদি আমার পৃষ্ঠদেশে ঝাড়িয়া বসেন, তবেই ত সর্ব্বনাশ! ঝাঁটাগাছটি মুড়ো বলিয়াই আমার এত ভয়, নহিলে নূতনে আমি অভ্যস্ত; সে পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। চিন্তাব্যাকুল চিত্তে, ভীতিবিহ্বল নেত্রে, গৃহিণীর মূর্ত্তির প্রতি এক একবার তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম কি সুন্দর! সে মূর্ত্তি আমার হৃদয়পটে এখনও যেন অঙ্কিত আছে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই বামাঙ্গীর বস্ত্রাঞ্চল কটিতটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জড়াইয়া আছে। মুখমণ্ডলে শ্যামাননের ন্যায় হাসি ও বিভীষিকা যেন মিশামিশি করিয়া আছে। সুমুখী তখন "করালবদনা," অথচ যেন "হসন্মুখী।" দেবী দ্বিভুজা; এক হস্তে কৃপাণরূপী করাল সম্মার্জ্জনী, আর এক হস্তে "সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ" সদৃশ সবৃন্ত সহকার বিলম্বিত। ভাবিলাম, দেবী দ্বিভুজা না হইয়া যদি চতুর্ভুজা হইতেন, তাহা হইলে ত আর দুই করে বরাভয় থাকিত। তাহা হইলে আমিও সাহস করিয়া, শবরূপে শয়ন করিয়া, চরণকমল হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সচ্ছন্দে বরাভয় কামনা করিতে পারিতাম।

দেবীর দিব্যরূপ দেখিতে দেখিতে, হৃদয়মধ্যে সে অনুপম কান্তি ধ্যান করিতে করিতে, আমার দিব্য জ্ঞান সঞ্চার হইল। দিব্যজ্ঞান প্রভাবে সাহসে ভর করিয়া তখন বলিতে লাগিলাম; "সুন্দরি! তুমি বড় বিসদৃশ প্রশ্ন করিয়াছ। সত্য সত্যই কি রসালের সহিত, না পৃথিবীর অন্য কোন সামগ্রীর সহিত তোমার তুলনা হইতে পারে? তুল-

নার আর কোন জিনিস নাই বলিয়াই এটা সেটা লইয়া তোমার একটা তুলনা কেবল অলঙ্কারসমাবেশের জন্য প্রয়োগ করা যায় বৈত নয়। নহিলে সামান্য অম্রফল কি তোমার সহিত তুলনীয় হইতে পারে? রসাল কেবল রসনা এবং বড় জোর না হয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে। কিন্তু তুমি যে আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রীতিকারিণী। আমার চক্ষে তুমি সুন্দর, আমার ঘ্রাণে তুমি কুসুমময়, আমার শ্রবণে তুমি সঙ্গীতময়, আমার রসনায় তুমি মধুর, আমার স্পর্শে তুমি তুষারশীতল। ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ যে মন, সেই মানসরাজ্যের তুমি অধীশ্বরী। স্বয়ং প্রাণ তোমার অনুগত চিরকিঙ্কর। তুমি প্রাণেশ্বরী। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র রসাল, আজ গৌরবে বড় ভারী হইয়াছে। তুমি যাহাকে আদর করিয়া হাতে ধরিয়াছ, সে আজ তোমারই গৌরবে, তোমা অপেক্ষাও বুঝি শ্রেষ্ঠ হই-য়াছে। আমি তোমার স্বামী; আমি সম্পর্কে তোমা অপেক্ষা বড় কেন? যেহেতু তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, তুমি আমায় দয়া করিয়া পদতলে রাখিয়াছ। তোমারই গৌরবে আমার গৌরব। তেমনি তুমি আজ পাণিতলে যাহাকে ধারণ করিয়াছ, সেই সহকার আজ বড় শ্রেষ্ঠ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। আম তোমার সতীন নয়, আম আমার শত্রু হইয়াছে বলিয়া, উহার মস্তকভক্ষণ, উহার রক্তশোষণ না করিয়া ত আজ আমি ছাড়িব না।"

রসময়ী ব্রাহ্মণী, রসিকের রহস্যবাদ শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলেন; এবং তখনি ঝাঁটা ফেলিয়া বঁটি লইয়া

ভালবাসা।

দ্বিতীয় সোপান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রসিকরঞ্জনের রসভাষা সমাপ্ত হইবামাত্র, অপরিচিত এক যুবক বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তাঁহার বর্ণ মসীকৃষ্ণ, চক্ষু লাল, মাথার মাঝে সোজা সিঁথি, বুকে বাঁকা ধরণে চাদর বাঁধা, বোতামের কোলে গোলাব ফুল গোঁজা, বামহস্তে ল্যাভেণ্ডারমাখা রুমাল, দক্ষিণ হাতে খাসা ছড়ি। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

সভ্যগণ!—ভালবাসার বক্তৃতা করা যার তার কাজ নয়। ভালবাসায় যার অভিজ্ঞতা নাই, ভালবাসায় যে পোড় খায় নাই, ভালবাসায় যে পাকে নাই, অন্ততঃ আট দশটা

ভালবাসায় যে উলটী পালটী খায় নাই, ভালবাসার রহস্য সে কিছুই বুঝে না। যে টপ্পা উড়াইতে জানে না, যে তবলায় চাটি মারিতে পারে না, যে. তেরেকিটি তাক্ সাধে নাই, যে রসিকতা জানে না, ভালবাসায় তার অধিকার নাই। যে লাজুক, যে ভাবুক, যে নির্জ্জনপ্রিয়, যে মজ্‌লিস্ মারে নাই, যে নেশায় আস্বাদ জানে না, সুরা-সেবন যে করে নাই, মারকুলি যে খায় নাই—

বাড়াবাড়ি দেখিয়া, আমি সভাপতিরূপে উত্থিত হইয়া ইহাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিলাম, "মহাশয়! ক্ষান্ত হউন, ক্ষমা করুন। অনর্থক বাজে ভাঁড়ামি শুনিবার জন্য এ সভা আহূত হয় নাই। আপনার রসিকতায় রসবোধ করিবার লোক এসংসারে যথেষ্ট আছে, অতএব যথাস্থানে গিয়া আপনি যশোলাভ করিতে থাকুন। এ সভাব সভ্যগণ এখন বোধ হয় সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য অধীর হইয়াছেন। অতএব আর কালহরণ না করিয়া, আমি সানুনয়ে সন্ন্যাসী মহাশয়কে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করি।"

অতঃপর সন্ন্যাসী সমুত্থিত হইয়া, চক্ষু বুজিয়া কিয়ৎক্ষণ মনে মনে ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান শেষ হইলে, নিম্নলিখিত চিরপরিচিত কবিতাটি উচ্চারণ করিয়া বৃন্দাবনবিহারীর চরণে প্রণাম করিলেন—

নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে॥

অনন্তর সভাপতি ও সভ্যগণকে যথাবিহিত সম্বোধন পুরঃসর বলিতে লাগিলেন—

সন্ন্যাসীর মুখে আপনারা ভালবাসার বক্তৃতা শুনিবেন, সাধ করিয়াছেন। জানি না, কেমন করিয়া সে সাধ আমি মিটাইব? আমার চিত্ত নীরস, আমার শক্তি পরিমিত, আমার ভাষা দুর্ব্বল, আমার প্রাণ বৈরাগ্যে বিহ্বলীকৃত। আমাব দ্বারা আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ভালবাসার মর্য্যাদা আমার দ্বারা রক্ষিত হইবে কি? সংসারগহনে আমি বৃক্ষচ্যুত গলিতপত্র, ভবার্ণবে আমি প্রবহমান ক্ষুদ্র তৃণ, মর্ত্ত্যধামে আমি ম্রিয়মাণ কীটাণুকীট তুল্য। ভালবাসার মহিমা আমি কেমন করিয়া বুঝাইব? সুখসাধে আমি জলাঞ্জলি দিয়াছি, আশা উদ্যম আমি বিসর্জ্জন করিয়াছি, ঘর সংসার আমার পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, বিশ্বচরাচর আমার পক্ষে অরণ্যময় হইয়া গিয়াছে, ভালবাসার তত্ত্ব আমি আর কেমন করিয়া দিব? পথ আমার গৃহ, অরণ্য আমার আশ্রয়, ভিক্ষা আমার সম্বল, চিন্তা আমার সঙ্গিনী, বিষাদ আমার বন্ধু, যন্ত্রণা আমার কুটুম্বিনী, ভালবাসার রহস্য আমার কাছে আর কি শুনিবেন? এই বিশাল বিশ্বভূমে আমার বলিতে আমার আর কেহ নাই, ভালবাসিতে আমার কেহ নাই, ভালবাসিবে এমন কেহ আমার নাই। ভালবাসার রাজ্যে আমি উদাসীন; সে পক্ষে সকল দিকেই আমার বিষম গোল।

এই দেখুন, প্রথমেই আমার প্রধান গোল, ভালবাসা শব্দটা লইয়া। ভালবাসা শব্দটায় আমার ঘোরতর আপত্তি। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তা নবকুমার যে ভাবে উঁহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, আমার আপত্তি সে ভাবের নহে। আমর আপত্তির

কারণ বরং তাহার ঠিক বিপরীত। ভালবাসা শব্দ রুচি-বিরুদ্ধ বলিয়া যিনি মতঘোষণা করেন, তাঁহার রুচির প্রশংসা করিতে আমি প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় এমন শব্দ যে সৃষ্ট হইয়াছে, এজন্য বাঙ্গালা ভাষাকে আমি গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি। এমন কোমল পদ, এমন মনোহর মাধুরী শব্দ রহস্যে বুঝি আর নাই। সমগ্র শব্দশাস্ত্র এক দিকে, আর একদিকে শুধু ঐ কথা—"ভালবাসা" রাখিয়া ওজন করিলে, আমার মতে শেষের দিক্‌টা নিশ্চয়ই ভারী বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু এই ভালবাসা শব্দটার বড় অপব্যবহার হইয়াছে। অনেক কথারই এইরূপ অপব্যবহার হইয়া পড়িয়াছে। বল্লাল সেন কুলমর্য্যাদা স্থাপনপূর্ব্বক নিয়ম করিলেন যে, যিনি নবধাগুণবিশিষ্ট, তাঁহারই নাম হইল কুলীন ;—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥

কিন্তু আজ ঐ ঘোর কদাচার পশুবৃত্তিপরায়ণ কুল-পাংসন কুলীন বলিয়া সমাজে সম্মান লাভ করিতেছেন।

আবার দেখুন, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি?

ক্ষমা দয়া দমো দানং ধর্ম্মং সত্যং শ্রুতং ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যং এতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণং॥

এই একাদশ লক্ষণের একটা লক্ষণও যাঁহাতে নাই, সকলই যাঁর অলক্ষণ, তিনিও আজ যজ্ঞসূত্রমাত্র গলায় দিয়া, ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতেছেন।

যজন যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, দান প্রতিগ্রহ, এই ষড়্‌বিধ কর্ম্মই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত। যিনি স্বকার্য্য ছাড়িয়া অন্য কার্য্যে আসক্ত হন, যিনি বেদ পাঠ করেন না, মহাত্মা মনু বলিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ অচিরেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

কিন্তু বঙ্গের ব্রাহ্মণ আজ না করিতেছেন এমন কাজই নাই। আর বেদের সহিত তাঁহার ভাশুর ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক হইয়াছে। অথচ মুখে বলিতেছেন, আমার মোজার ধূলা মাথায় দাও, তোমার পরকালের মঙ্গল হইবে।

গুরু বলিয়া একটা কথা আছে। সে গুরু কাহাকে বলা যায়? গুরু বলিয়া কাহার পায়ে প্রণাম করি?

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

কিন্তু আজিকার যিনি গুরু তিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার বিশ্বব্যাপী চরাচরগুরুর চরণ শিষ্যকে দেখাইবেন কি, কেবল গোল গোল রূপার চাক্তী ও চক্রাকাররূপী লুচির দিকে চাহিয়াই নিজের চক্ষু স্থির।

আচার্য্য কাহাকে বলে?

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

যিনি, শিষ্যকে উপনয়ন করাইয়া, কল্পসহিত সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহার নাম আচার্য্য। কিন্তু বেদ শিখান দূরে

থাকুক, এখনকার দিনে, বেদীতে বসিয়া, বেদের মাথায় যিনি শত সম্মার্জ্জনী প্রহার করেন, তিনিই আচার্য্যপদবাচ্য। শব্দা-র্থের এরূপ বিড়ম্বনা ইহার অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

ভালবাসা শব্দেরও বিড়ম্বনা ঠিক এইরূপেই হইয়াছে। ভালবাসার নাম যদি আত্মসমর্পণ হয়; পরের প্রাণে আপ-নার প্রাণ মিশাইয়া দেওয়ার নাম যদি ভালবাসা হয়, পরের অস্তিত্বে আপনার অস্তিত্ব ডুবাইয়া দেওয়াকেই যদি ভালবাসা বলে; যাহাকে ভালবাসিয়াছি সে আর পর নয়, তাহার আত্মায় আমার আত্মায় যোগ হইয়া দুযে এক হইয়া গিয়াছে;—ইহ-পরকালে সে যোগভঙ্গ হইবার নহে, সে আর পর হইবার নহে; ইহারই নাম যদি ভালবাসা হয়, তবে ভালবাসা শব্দের যে বিষম বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে, তাহা আর একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

যার যখন খুসী, যার যাহাকে খুসী, সেই তাহাকে আসিয়া বলিতেছে আমি তোমায় ভালবাসি। পান থেকে চূণটুকু খসিলে যার ভালবাসা টুটিয়া যায়, সেও বলে আমি তোমায় ভালবাসি। বিলাসে বাধা পড়িলে যার বুকে ব্যথা হয়, সেও বলে আমি তোমায় ভালবাসি। ভালবাসার পাত্র দশদিন নজর-ছাড়া হইলে যাহার ভালবাসার ঘোর কাটিয়া যায়, সেও বলে আমি বড় ভালবাসি; তিরস্কারের ভরটুকু যার গায়ে সয় না, সহিষ্ণুতার লেশমাত্র যার অভ্যস্ত হয় নাই, সেও বলে আমি বড় ভালবাসি। এক ফোঁটা জল লাগিলে যিনি গলিয়া যান, রবিকিরণের আঁচ্ লাগিলে যিনি জল হইয়া যান, তিনিও বলেন, আমি বড় ভালবাসি।

লোকের কথায় যে ভালবাসা কমায় বাড়ায়, ছাড়ে ধরে, সেও বলে আমি ভালবাসি। পরের পরামর্শ লইয়া যে ভালবাসার চর্চ্চা করে, সেও বলে আমি ভালবাসি। নূতন দেখিলে পুরাতনে যাহার প্রীতি আর থাকে না, সেও বলে আমি বড় ভালবাসি। ভালবাসার একি কম লাঞ্ছনা?

বিধবা দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া বলিতেছেন, প্রাণনাথ! আমি তোমায় ভালবাসি। সধবা স্বামি-ত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতেছেন, নায়ক হে! আমি বড় ভালবাসি। বিদুষী বাল্যবিবাহে ঘৃণা করিয়া, যৌবনবিলাসের সাধ মিটাইতে গিয়া বলিতেছেন, ভালবাসিতে কি আমি জানি না? রূপাভিলাষী নিত্য নূতন রূপে মজিয়া ভালবাসার গৌরব রক্ষা করিতেছেন, বিষয়াভিলাষী বিষয়মদে মত্ত হইয়া ভালবাসার সাধ মিটাইতেছেন। নাটকের নায়িকা জলের ঘাটে স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ হয় ত পুকুরপাড়ে মেঠো নায়ক দেখিয়া, কলসী ফেলিয়া কাঁদিতে বসিল,—আমি তারে ভালবাসি। নবেলের নবীনা বালা ঘোর তুফানে জলে ডুবিয়া মরিয়াছিল, মন্ত্রৌষধিবলে পুনর্জ্জীবিত হইয়া, চক্ষু চাহিতে না চাহিতে, মাথার শিয়রে অপরিচিত এক নব যুবককে দেখিয়া, ভালবাসার নেসায় আবার তখনি ঢলিয়া পড়িল, আর মাথা তুলিতে পারিল না! থিয়েটারের অভিনেতা বীর রসের ব্যঙ্গ করিয়া ভালবাসার অভিনয় করিতে থাকেন; অভিনেত্রী ট্যাড়া-বাঁকা টানা সুরে কথা কহিয়া, আর বেসুরে আবোল তাবোল বকিয়া ভালবাসার রঙ্গে অঙ্গ জল করিয়া দেন। যাত্রার ছোক্‌রা নাচিয়া নাচিয়া

ভালবাসার গান গাহিয়া আসর মাতাইয়া ফেলে; আর নর্ত্তকী আড়নয়নে আঁখি ঠারিয়া, আড়্খেম্‌টায় পা ফেলিয়া, বারইয়ারীর মজ্‌লিসে ভালবাসার গানে বাবুদের মগজ্ গরম করিয়া তুলে। ভালবাসা পণ্য দ্রব্য হইয়াছে; বট-তলায় হাটতলায় ভালবাসার বেচাকেনা চলিতেছে; মাঠে ঘাটে ভালবাসার ছড়াছড়ি হইতেছে; মদের মজ্‌লিসে ভালবাসার মহিমা গীত হইতেছে; বেশ্যালয়ে ভালবাসার বীভৎস লীলা অভিনীত হইতেছে। হায় ভালবাসা! স্বর্গ হইতে নামিয়া, পৃথিবীর মাটিতে মিশিয়া তুমি কেন এমন মাটি হইতে আসিয়াছিলে?

সকল দিকেই ভালবাসার এইরূপ ভণ্ডামি, সর্ব্বত্রই ভাল-বাসার এমনি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। যে আমার ঘোর শত্রু, অন্তরে অন্তরে যে আমায় অধঃপাতে দিবার চেষ্টায় ফিরি-তেছে, সেও মুখে বলে যে আমি তোমায় ভালবাসি। যে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে, যে আমার সর্ব্বস্ব হরণ করি-তেছে, সেও বলে আমি তোমায় ভালবাসি। ইংরেজ অম্লানবদনে বলেন; ভারতবাসীকে আমি বড় ভালবাসি। যে ইংরেজ্ আমাদের ধন-মান, আমাদের অন্ন-বস্ত্র, আমাদের শিল্পসাহিত্য, আমাদের স্বাস্থ্যসামর্থ্য, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, আমাদের গৌরব-কীর্ত্তি, আমাদের রীতি-নীতি, আমাদের ভক্তি-প্রীতি, আমাদের সুখ-সম্পদ, আমাদের আশা-ভরসা, আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, আমাদের ইহ-পরকাল সর্ব্বস্বই স্বতঃ পরতঃ হরণ করিয়া লইতেছেন; তাঁহার মুখে যখন ভালবাসার এত ভাণ্, এত আস্ফালন, তখন আর অন্যের কথা কি বলিব?

ইংরেজের কথা কেন, ভালবাসায় এই ভণ্ডামি, আমাদের স্বদেশবাসিদিগের মধ্যেও ত শতসহস্র প্রকারে দেখিতে পাই। আধুনিক দেশহিতৈষীর দৃষ্টান্তে, কথাটা আরও স্পষ্টপ্রকারে বুঝা যায়। স্বদেশকে ভালবাসি বলিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া যাঁহারা মেদিনী কাঁপাইয়া বেড়ান, বাস্তবিক দেশের কোন খান্‌টাই ত তাঁহারা ভালবাসেন না। দেশের ভাষা দেশের পরিচ্ছদ, দেশের আহার দেশের আচার, দেশের ঔষধ দেশের চিকিৎসা, দেশের আমোদ দেশের ক্রীড়া, দেশের পর্ব্ব দেশের উৎসব, দেশের ধর্ম্ম দেশের শাস্ত্র, কিছুই তাঁহারা ভালবাসেন না; অথচ দেশ-ভক্তির ধ্বজা লইয়া দেশ বিদেশে তাঁহারা গলাবাজি করিয়া বেড়ান। দেশের সকল বিষয়েই যাঁহাদের নিদারুণ বিদ্বেষ, তাঁহারাই বলেন দেশকে আমরা বড় ভালবাসি। এ ভণ্ডামি কি ভালবাসার ঘোরতর বিড়ম্বনা নয়?

ইংলণ্ডের কবি বলিয়াছেন,—

"England! with all thy faults I love thee still."

"ইংলণ্ড! তোমার যত দোষই থাকুক্ আমি তবু তোমায় ভালবাসি।" কথাটা বিদেশের হইলেও ভালবাসার মহা-মন্ত্র বটে। ভালবাসার ব্যাখ্যায় কথাটা কিন্তু আমি আর একটু উঁচু করিয়া বলিতে চাই। যাহাকে ভালবাসি, তাহার দোষ থাকে থাকুক, তবু তাহাকে ভালবাসি, একথা আমি বলিতে চাই না। আমি বলি যাহাকে ভালবাসি, তাহার দোষ থাকিতেই পারে না। তাহার দোষ পৃথিবীর লোক দেখে দেখুক, আমি ত দেখিতে পাই না, দোষ

দেখিতে যে পায়, ভালবাসিতে সে জানে না, ভালবাসার ভাব তার ষোল কলা পূর্ণ হয় নাই। আমি যাহাকে ভালবাসি, সে যে আমার আপনার জিনিস, তাহার মন্দ কি আবার কিছু থাকিতে পারে? তাহার সকলই ভাল, সকলই সুন্দর, সকলই সবার উপর। তার খাঁদা নাক্, তার চ্যাপ্টা মুখ্, তার গোলচক্ষু, তার ছোট চুল্ সকলই সুন্দর, সকলই মনোহর। তার যেখানে যে তিলটি, যে আঁচিল্‌টী আছে, সে সকলই রূপের সজ্জা, দেহের ভূষণ। সেগুলি যার নাই, সে সুন্দর হইলেও, তাহার সৌন্দর্য্য যেন অঙ্গহীন বলিয়া আমার চক্ষে প্রতীয়মান হয়। সৌন্দর্য্য আর কিছুই নহে, আমি যাহা ভালবাসি, তাহাই ত সুন্দর। আমি যাকে ভালবাসি, তার রং যদি কাল হয়, তবে আমি বলি কৃষ্ণবর্ণ ই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণ। তোমাদের চক্ষে সে কাল বলিয়া ভাল লাগিতে না পারে, কিন্তু আমার কাছে সে কালরূপেই জগৎ আলো করিয়া আছে। তোমরা কাল কাল বলিয়া আমার কাণের কাছে কর্কশবাক্য বর্ষণ করিও না; সৌন্দর্য্যের সার তোমরা বুঝ না, কালর মহিমা তোমরা জান না। জটিলার প্রতি কৃষ্ণপ্রণয়িনী রাধিকার তিরস্কারবাক্যে ভালবাসার কি মর্ম্মোচ্ছ্বাস স্ফূরিত হইতেছে দেখুন,—

সে কি কাল তুই দেখে এলি কাল যায়?
কালের কাল যায়, সে কালপূজায়।
সেই কাল দরশনে জীবের কাল দরশন যায়।
সেই কালরূপ জেনে ভালরূপ, শশীভাল যায় ভাল বাসে; তোর ভাল লাগে না তায়॥

দেবাদিদেবের চরণপ্রাপ্তির আশয়ে পার্ব্বতী কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। ছলনা জন্য স্বয়ং মহাদেব বিট্‌লে বামুনের বেশ ধরিয়া, তাঁহার কাছে গিয়া কতমতে শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। শুনিয়া তপস্বিনী রুষিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "ঠাকুর! যাও, যাও বিশ্বমূর্ত্তি মহাদেব, তাঁহার মহিমা কে বুঝিবে? কিন্তু বুঝি আর না বুঝি, বিবাদে কাজ নাই। তুমি যাই বল, তিনি যেমনই হউন না, আমার চিত্ত তাঁহাতে একান্ত ডুবিয়াছে, আমি কারও কথা শুনি না। প্রেমের ব্যাপারে লোকের কথায় কর্ণপাত করিতে গেলে চলে না।"

মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং
ন কাম বৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥

ভালবাসা কাহারও কথার অপেক্ষা রাখে না। ভালবাসা রূপের অপেক্ষা করে না। ঐ নবীন-নধর সুঠাম-সুন্দর রাজপুত্র অপেক্ষা আমার এই গোড়ে-গোরদা খোঁড়া ছেলে-টিও আমার চক্ষে সুন্দর নয় কি? আর অামার এই উট্‌-কপালী উনন্‌-মুখীর কাছে তোমার সিংহাসনবিলাসিনী রূপসী অপ্সরা কখনও দাঁড়াইতে পারে কি? ভালবাসা গুণেরও অপেক্ষা করে না। ভালবাসা গুণসাপেক্ষ বলিয়া যাঁহারা বুঝাইতে চাহেন, আমার মতে তাঁহারাও মহাভ্রান্ত। আমার এই হ্যাণ্ডনোট্‌-কাটা জেল্‌ফেরৎ জুয়াচোর পুত্র অপেক্ষা তোমার সোণারচাঁদ সবজজপুত্রকে কি বেশী ভাল-বাসিতে পারি? আমার প্রেয়সী উঠিতে বসিতে আমায় মুখনাড়া দেন, রাত্রিকালে রাগ করিয়া কতদিন ঘরের

কবাট খুলিয়া দেন নাই, প্রাতঃকাল না হইতে হইতেই তবু গিয়া কেন তাঁহার পায়ে ধরি বল দেখি?

ভালবাসার নিয়ম অতি দুর্জ্ঞেয়। ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যেমন বলেন যে আমি এইমাত্র জানিয়াছি যে জগদীশ্বরকে জানা বড় কঠিন, তিনি দুর্জ্ঞেয়; তেমনি প্রেমিককে প্রশ্ন করিলে প্রেমের তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই তিনি উত্তর প্রদান করিবেন। প্রেমিক আপনার চিত্তকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছে, তবু জানিতে পারে না যে কেন ভালবাসি। রূপ নাই, গুণ নাই তবু বুঝিতে পারে না যে কেন ভালবাসি। যাহাকে ভালবাসিয়া যন্ত্রণা হয়, ভালবাসিয়াও যাহার মন পাওয়া যায় না, তবুও বুঝে না যে কেন ভালবাসি। এই শুনুন প্রেমিকের মর্ম্মোক্তি—

জানি না যে কেন ভালবাসি!
যতনে যাতনা বাড়ে, তবু তার অভিলাষী।

আবার, সে ভালবাসে কি না বাসে তা বুঝি না তবু তাকে ভালবাসি। তার প্রতিদান চাই না, তাকে ভালবাসিয়া আমি ভাল থাকি, তাকে ভাল না বাসিলে আমি কে জানে কেন থাকিতে পারি না, তাই তাকে ভালবাসি।

বাসে বা না বাসে ভাল, ভাল বেসে থাকি ভাল।

ভালবাসা ভোগ করিবার আশা বিফল হইল; বাসনার সাগরে আমি চিরকাল ভাসিতে লাগিলাম; অন্তরের কামনা অন্তরেই রহিয়া গেল, তথাপি তাহাকে ভালবাসি।

কি হলো বিফল আশা বাসনা সাগরে ভাসি॥

কেন ভালবাসি তা জানি না। ভালবাসার কারণ, তোমরা কেহ আমার কাছে জানিতে চাহিও না; আমি নিজেই তাহা জানি না, আমার চিত্ত জানে না, আমার বুদ্ধি বলিয়া দিতে পারে না। আমি আত্মহারা হইয়াছি, আমি উন্মত্ত হইয়াছি, আমি যন্ত্রণানলে পুড়িয়া মরিতেছি। আমি অকূল পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, তবু আমি ভালবাসি। ইহাই প্রেমিকের রীতি, ইহারই নাম ভালবাসা। ভালবাসার যদি কোন নিয়ম থাকে, তবে তাহা এই যে,—

জানি না যে কেন ভাল বাসি!

ভালবাসার এই সঙ্গীত যিনি রচনা করিয়াছেন, প্রণয়-রাজ্যের মহাকবি বলিয়া তাঁহার পায়ে প্রেমিকে চিরপ্রণাম করিবে। ভালবাসার মূলতত্ত্ব এক কথায় ইহার ভিতর নিহিত আছে; কিশোরীর নবসঞ্চারিত, লজ্জাজড়িত প্রণয়-লীলার ন্যায় কি এক অনির্ব্বচনীয় মাধুরী ইহার স্বরে স্বরে যেন গাঁথা আছে। এই গান সর্ব্বপ্রথম যে দিন আমার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিয়াছিল, যে দিন আমি গান শুনিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায়, ভুজঙ্গদংশিতের ন্যায় কাতর হইয়া পড়িয়া-ছিলাম—সে দিন হায়! সে দিন এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে! আজ হঠাৎ গায়কের কলকণ্ঠে সেই পুরাতন সঙ্গীত, সেই চিরমধুর আমার চির-প্রীতিকর সঙ্গীত শুনিয়া আমার সে সময়ের কথা সকলই মনে পড়িয়া গেল। ভাল-বাসার এই সভামধ্যে, ভালবাসার সহস্র ব্যাখ্যা শুনিয়া, এবং ভালবাসার মর্ম্মকথা আমার সাধ্যমত বুঝাইতে গিয়া, আমি আর আত্মগোপন করিতে পারিতেছি না। আজ আপনারা

আমায় দেখিতেছেন আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী; কিন্তু আমি ত চিরসন্ন্যাসী নয়। আমার গৃহ ছিল, সংসার ছিল; আর সংসারের সার যে ভালবাসার সামগ্রী তাহাতেও আমি বঞ্চিত ছিলাম না। ভালবাসার সামগ্রী ছিল বটে, কিন্তু ভালবাসায় আমি চিরবঞ্চিত। আজ সন্ন্যাসীর শুষ্ক চিত্তে অতীতের তরঙ্গ আবার বহিল কেন? তরঙ্গ ছুটিল ক ভূতকথা বিবৃত করিয়া আজ চিত্তের ভার লাঘব করিব। আমার ভালবাসার ইতিহাস আজ অকপটে আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিব।

আমি ভাল বাসিতাম—নবীন যৌবনে, দুর্দ্দান্ত হৃদয়ের দুরন্ত আবেগভরে আমি একদিন ভালবাসিতাম। প্রাণের যত পিপাসা, হৃদয়ের যত বৃত্তি, চিত্তের যত বন্ধন সকলই আমার সেই ভালবাসায় জড়ান ছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাম আমার ভালবাসায় আচ্ছন্ন ছিল, আমার ভালবাসার বেগ তাহারা যেন সহ্য করিতে পারিত না। ভালবাসায় আমার চক্ষু অন্ধ, আমার কর্ণ বধির, আবার রসনা বিকল, আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় তেজোহীন, আমার চর্ম্ম অসাড়, আমার হস্তপদাদি অবশ, আমার চিত্ত অধীর হইয়াছিল। ভালবাসা ভিন্ন অন্য কথা আমি শুনিতাম না, অন্য সৌন্দর্য্যে দৃক্‌পাৎ করিতাম না, অন্য স্বাদ, অন্য গন্ধ, অন্য স্পর্শ অনুভব করিতাম না, অন্য চিন্তার অবকাশ মনোমধ্যে আর থাকিত না। তাই বলি, আমার ইন্দ্রিয়সকল এক ভালবাসাতেই এক প্রকার ব্যতিব্যস্ত থাকিত, অন্য ব্যাপারে তাহারা একবারে যেন নিশ্চেষ্ট নিঃসামর্থ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু এমন করিয়া ভালবাসিয়াও, ভালবাসায় আমি কখনও সুখ পাই নাই। আমার ভালবাসা, শৈলতল-বাহিত অনন্ত-প্রধাবিত নদীতরঙ্গের ন্যায় পাষাণের পাদমূলে নিয়ত প্রতিঘাত করিত; পাষাণ সে তরঙ্গাঘাতে কখনও ভাঙ্গিল না ক্ষয়িল না, ডুবিল না টলিল না। পাষাণ ভাঙ্গিয়া, পাষাণ বুকে করিয়া আমি ত ভাসাইতে পারিলাম না। আমার ভালবাসা, তরঙ্গে তরঙ্গে পর্ব্বতপদপ্রান্তে মাথা কুটাকুটি করিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া নৈরাশ্যের কাতরতায় অলক্ষ্যে ছুটিত; পাষাণ ভাঙ্গিয়া, পাষাণ গলাইয়া, সোজা পথে সরল হইয়া কখনও ললিত-লহরী খেলিতে পাইল না। আমার ভালবাসা, গহনজাত, পাদপাচ্ছন্ন কুসুমকলিকার ন্যায়, মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ ছড়াইয়া সচ্ছন্দে কখনও ফুটিতে পাইল না; রবিরশ্মিসম্প্রপাতে কখনও সে বনকুসুম প্রাণ ভরিয়া প্রাণের হাসি হাসিতে পাইলু না। আমার ভালবাসা, বালবিধবার পতিপূজাভিলাষের ন্যায়, অন্তরে উদিত হইয়া অন্তরেই লয় পাইল; কত সাধের গাঁথামালা যমুনার জলে ভাসান গেল, দেবতার গলে দোলান হইল না। আমার ভালবাসা, অমাবস্যার নিশীথ নীল গগণে লক্ষ লক্ষ যোজনের ললিতোজ্জল তারকারাশির ন্যায় অন্ধকারে মিটি মিটি ফুটিয়া, আঁধারে আঁধারেই আবার নিবিয়া গেল, আলোকের মুখ কখনও দেখিতে পাইল না। আমার ভালবাসা, মুমূর্ষু রোগীর দেহে (blister) তীব্র প্রলেপের ন্যায় যন্ত্রণায় জ্বালাইয়াই চলিয়া গেল, আরোগ্যের শান্তি জন্য আর অপেক্ষা করিল না। দুঃখের

দাবদাহেই আমার ভালবাসার অবসান হইল, সুখের শীতলত্ব কখনও অনুভব করিতে পাইল না। কিন্তু এই অসহ্য অন্তর্দাহে দগ্ধ হইয়াও আমি মুখ ফুটিয়া সে কথা কখনও কাহাকে বলি নাই, যাহার জন্য এত যন্ত্রণা তাহাকেও ইঙ্গিতে জানাই নাই। কেন জানাই নাই, সে কথার উত্তর বঙ্গসাহিত্যে আছে :—

আমার মনোবেদনা কভু শুনাওনা তায়।
শুনিলে আমার দুখ, সে পাছে বেদনা পায়॥
না বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল,
শুনি তার মঙ্গল তবু ত প্রাণ জুড়ায়॥

কিন্তু সেই যে আমার যন্ত্রণা—সে যন্ত্রণাও ত অধিক দিন ভোগ করিতে পাইলাম না। সে যন্ত্রণা যতদিন ছিল, ততদিন আমি মানুষ ছিলাম, সংসারী ছিলাম; অসহ্য অনন্ত শিখা বুকের ভিতর বহন করিয়া অতিকষ্টে অন্ধকারসমুদ্র পার হইয়া আসিতেছিলাম। তাহার জন্য যে কষ্ট, সে কষ্টের ভিতরেও আমার যেন শান্তি ছিল; তাহার জন্য যে দুঃখ, সে দুঃখকেও আমি সুখ বলিয়া মনের সাধ মনেই মিটাইতাম; তজ্জন্য যে শোকাশ্রু, তাহা আনন্দাশ্রু বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রমত্ত চিত্তকে প্রবোধ দিতে পারিতাম। জ্বরের উত্তাপ যতদিন ছিল, ততদিন বিকারের সহস্র উপসর্গ সত্বেও তবু ত দেহে প্রাণ ছিল। কিন্তু যেদিন জ্বর ত্যাগ হইল, দেহযন্ত্রের কলবল যেদিন অচল হইল, উত্তাপ ঘুচিয়া যেদিন হিমাঙ্গ হইল, সেইদিন সব ফুরাইল, প্রাণপক্ষী পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া সেইদিন জনমের মত উড়িয়া গেল। সব ফুরাইল

বটে, প্রাণ বিয়োগ হইল বটে, কিন্তু কেমন যে রোগ তা জানি না, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য ত গেল না। শক্তি গেল স্মৃতিলোপ ত হইল না। বিষয় গেল, বাসনার অবসান ত হইল না। রূপ গেল, দৃষ্টি ত অন্ধ হইল না। সরোবর শুকাইল, পিপাসা ত মিটিল না। কুসুম কীটে কাটিল, ঘ্রাণের তবু ত ব্যত্যয় হইল না। সঙ্গীত থামিল, শ্রবণ তবু ত বধির হইল না। তরণী ডুবিল, আরোহী তবু ত জলমগ্ন হইল না। আমি না মৃত না জীবিত, না জাগ্রত না সুষুপ্ত, না রুগ্ন না সুস্থ, না অচল না চঞ্চল, না সহজ না উন্মত্ত, না শান্ত না উত্তপ্ত, না মানুষ না ভূত, কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া, ইহ-পরকালের সম্বন্ধ ভুলিয়া, ইহ জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া, সেইদিন হইতে বিকল বিহ্বলচিত্তে ব্যাকুল হইয়া অকূলে ভাসিতে লাগিলাম।

সেদিন কি ভয়ঙ্কর! ধীরে ধীরে আমার ভগ্নতরী লইয়া কালস্রোতে গা ভাসাইয়া আমি চলিয়া যাইতেছিলাম। দিক্ বিদিক্ আমার লক্ষ্য ছিল না, সুখসমীরণ আমার সহায় ছিল না, তরণী আমার বশে চলিতেছিল না। তথাপি আমি সুখে দুঃখে, দুঃখময় সুখে সন্তুষ্ট হইয়া, স্রোতো-বশে যে দিকে হউক—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম যখন যে-দিকে-হউক, কোন একদিকে অলক্ষ্যে ভাসিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ সে দিন, কি ভয়ঙ্কর প্রলয়বাত্যা সমুত্থিত হইল। হঠাৎ কোন্ দিক্ হইতে ঝড় বহিল দেখিতে পাইলাম না, কখন মেঘোদয় হইল, দেখি নাই; কতক্ষণ হইতে প্রলয়-রঙ্গের আয়োজন হইতেছিল জানিতে পারি নাই। হঠাৎ

দেখিলাম, প্রভঞ্জন শন্ শন্ রবে আকাশ অবনী আকুল করিয়া, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বিকম্পিত করিয়া, প্রচণ্ডবেগে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। ঘন ঘন বজ্রপাতের বিকট শব্দে দিগন্ত প্রতিশব্দিত হইতে লাগিল। জলধি পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ তুলিয়া, মহাদম্ভে, সেই সঙ্গে রণরঙ্গে মাতিয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি সাগরে আকাশে, আকাশে সাগরে যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। রাশি রাশি কালমেঘ আসিয়া ক্রমে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তব্যাপী অন্ধকারে অনন্ত শূন্য ভরিয়া গেল। মাঝে মাঝে ক্ষণপ্রভার পিঙ্গলালোকে সে অন্ধকারসমুদ্রে যেন ফেণিল তরঙ্গের নৃত্যলীলা অভিনীত হইতে লাগিল। আতঙ্কে আমি আর চক্ষু চাহিতে পারিলাম না। সভয়ে চক্ষু মুদিলাম। চক্ষু চাহিয়াও যে অন্ধকার, চক্ষু মুদিয়াও সেই অন্ধকার। ভুবন ব্যাপিয়া যেন অন্ধকারের রাজত্ব। অন্ধকাররাজ্যে প্রভঞ্জন দেব যেন মহাকালের প্রলয়ভেরী বাজাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ডভেদী কোলাহলে আমার কর্ণ বধির হইয়া গেল। তরঙ্গতাড়নে আমার ক্ষুদ্রতরী মুহুর্মুহু নাচিতে কাঁপিতে লাগিল। তরণীর সঙ্গে সঙ্গে আমি কাঁপিলাম, বোধ হইল যেন বিশ্বচরাচর ঘোর ঘন কম্পনে নৃত্য করিতেছে। ক্রমে আমার চৈতন্য লোপ হইয়া আসিল। কোথায় কি হইল, কিসের পর কি হইল, আর দেখিতে পাইলাম না।

অচেতন হইয়া কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। চৈতন্যোদয়ে চাহিয়া দেখি, তরণী আর নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, তরণীর চিহ্নমাত্র কোন

দিকে দেখিতে পাইলাম না। কোনদিকেই কেহ কোথাও নাই, কেবল অনন্তবিস্তারিত দুরন্ত বারিধি তরঙ্গ-ভঙ্গে ভ্রুকুটি করিয়া রণরঙ্গে নৃত্য করিতেছে। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলাম, প্রলয়ের ঘনঘটা তেম্‌নি বিকটরবে ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে। উপরে বজ্রবাহী জলধর, আর নিম্নে জলনিধি সমুদ্র, উভয়ে আড়াআড়ি করিয়া, উভয়ে গলাগলি করিয়া, সমানে গর্জ্জন করিতেছে। যেদিকে চাই, কেবল অনন্ত সাগর, আর অনন্ত শূন্য, অনন্ত নীলিমায় ধূ ধূ করিতেছে। সেই জলধি-জলধরের অপূর্ব্ব রঙ্গলীলা মধ্যে আমি একাকী পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম। লোক নাই লোকালয় নাই; কূল নাই, দ্বীপ নাই; বৃক্ষ নাই, পর্ব্বত নাই; কেবল শূন্য আর সলিলরাশি। তরঙ্গতুফানে নাচিতে নাচিতে, তরঙ্গতুফানে ভাসিতে ভাসিতে, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা হইয়া কথন্ কোন্‌দিকে আমি চলিলাম তা বলিতে পারি না। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত, ক্ষণে ক্ষণে চেতনাযুক্ত হইয়া আমি চলিলাম। কতদিন, কতরাত্রি, এইভাবে আমার মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গেল তা জানি না। দিবারাত্রির প্রভেদজ্ঞান আমার ত কিছুই ছিল না; দিনরাত্রি তখন আমার সমান বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে, এম্‌নি করিয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে, কতদিন পরে তা কে জানে, অবশেষে একদিন একটা উপকূলে গিয়া উঠিলাম। তখন আমার যে অবস্থা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তখন আমি জীবন্মৃত। সমুদ্রের তুফান, আকাশের তুফান তখন একটু থামিয়াছে

বটে, দিঙ্‌মণ্ডল তিমিরাবসানে তখন ঈষদালোকময় হই-য়াছে বটে। আলোকসাহায্যে দেখিলাম, যেখানে উঠি-য়াছি, সে এক অনন্ত বিস্তারিত নিবিড় গহন। অরণ্য আর লোকালয়, আমার পক্ষে তখন সব সমান;—সব একাকার। গহনের হিংস্রপ্রাণী আমায় দেখিয়া যেন বিদ্রূপভরে বিকট গর্জ্জন করিয়া চলিয়া গেল, ঘৃণা করিয়া আক্রমণ করিল না। কত কষ্টে গহন পার হইয়া দেখি সম্মুখে অনলময় বালুকাপূর্ণ ভীষণ মরুপ্রান্তর। প্রান্তর পারে দেখিলাম লোকালয় আছে বটে, কিন্তু সে জনপদ আমার পক্ষে অরণ্য বলিয়াই প্রতীত হইল। জনপদবাসী জীবগণ আমার সহিত কথা কহিতে আসিলে শ্বাপদজ্ঞানে আমি চমকিত হইলাম; আমার আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহারা সরিয়া গেল। গৃহপ্রাসাদ সকল দ্বার-গবাক্ষরূপ মুখ বিকাশ করিয়া যেন আমায় গিলিতে আসিল। ক্ষিপ্ত শৃগালের ন্যায়, যমদূততাড়িত প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় অস্থির হইয়া আমি গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া আবার পথে পথে ফিরিতে লাগিলাম। একটা ভবনে একবার প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তথায় উৎসবের বড় ধূম লাগিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই! এ কিসের উৎসব?" ভ্রুকুটি করিয়া সে উত্তর দিল, "পাষণ্ড! তুমি এমন পাগল যে দুর্গোৎসব দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না,—তোমার মাথা মুণ্ড কি হইতেছে? মহাষ্টমীর দিনেও তোমার মাথা ঠিক হইল না?" আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া আবার একজনকে প্রশ্ন করিলাম, "ভাই! একি

শ্মশানকালী! নহিলে পিশাচের নৃত্যসহিত হিঃ হিঃ রব শ্মশান ভরিয়া উঠিয়াছে কেন?" সন্ধিক্ষণে যে বলিদান করিয়াছিল, তাহার হাতে সেই রুধিরস্রাবী খড়্গ তখনও দুলিতেছিল। কথাটা তার কাণে গেল। সে সেই খড়্গ লইয়া আমায় তাড়া করিল। আমি একলম্ফে দ্বারলঙ্ঘন পূর্ব্বক বাড়ী ছাড়িয়া পথে গিয়া পড়িলাম। পথে দেখি, লোকে লোকারণ্য। দলে দলে, কাতারে কাতারে, লোক সকল, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রাচীনে মিলিয়া আরতি দেখিবার জন্য ছুটিয়াছে। আরতির বাজনা আমাব কাণে বাজিল। বোধ হইল যেন গঙ্গা-যাত্রার সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। আমি "গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া একদিক দিয়া উধ ও ছুটিতে লাগিলাম।

তদবধি, আমি ছুটিয়া ছুটিয়া পথে পথেই ফিরিতে লাগিলাম। কখন্ কোথায় যাই, কখন্ কোথায় খাই, কিছুরই স্থিরতা থাকে না। অতিথি দেখিয়া কেহ দয়া করিলে, বা পাগল বলিয়া বালকে উপহাস করিলে সুখ দুঃখের অধীন হইতাম না। সন্ন্যাসী হইয়া সংসারের রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। উৎসবের পর উৎসব, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, সচ্ছন্দে আমার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ষা শরৎ, শীত বসন্ত, একে একে কাটিয়া গেল, ফলাফল আমার কাছে সকলই সমান। বর্ষায় ময়ূর নাচিল, নদী মাতিল, কৃষক হাসিল, ধরণী ভাসিল। আমি ত ভাসিয়াই আছি, আমার পক্ষে আর নূতন কি? শরতে কুসুম ফুটিল,

যামিনী জ্বলিল, ধরণী শস্যভূষণে মরকতের মালা দোলা-ইলেন, আকাশ মেঘদল বিদূরিত করিয়া নীল কান্তি প্রকটিত করিলেন। আমার হৃদয়াকাশের ঘনজাল ত বিদূরিত হইবার নহে। হেমন্তে পদ্মিনী মলিনা, তটিনী যৌবনহীনা হইয়াও তথাপি আপনার সৌন্দর্য্য সমূলে ত্যাগ করিলেন না। শীতের তাড়নে ধরণী কম্পিতা হইয়াও উৎসবের উল্লাস পরিহার করিলেন না। আর শীতাবসানে ঋতুরাজ কল-কণ্ঠে পঞ্চমের তান ছাড়িয়া জগতের শিরায় শিরায় মধু সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। আমার শিরায় শিরায় কিন্তু হলাহলের ধারা তেম্‌নি প্রবল প্রবাহে ছুটিতে লাগিল।

উৎসবের পর উৎসব আসিল, চলিয়া গেল; আমার হৃদয়ের নিরুৎসব কিছুতেই ত ঘুচিল না। দুর্গোৎসবের পর লক্ষ্মীপূজা আসিল। কোজাগর পূর্ণিমার পূর্ণালোকে আমি ডাকিলাম, "এস, এস মা লক্ষ্মি! জন্মের শোধ বুঝি মায়া কাটাইয়া চিরবিদায় লইতে আসিয়াছ, এস তোমায় প্রণাম করি। ধরণী শ্রীহীনা হইয়াছে, আমিও এইবার লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি, তবে আর কেন কমলা! মায়া বাড়াইয়া কাজ কি? এস তোমায় জনমের মত প্রণাম করি।" কমলার পর কালী আসিলেন। অমাবস্যার অর্দ্ধরাত্রে, মহানিশার মাহেন্দ্র-ক্ষণে করালবদনা মহাকালী। ভাবিলাম আমার উপযুক্ত ইষ্টদেবতা বটে। এতক্ষণ কোথা ছিলে মা! এতকালের পর, যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছিলাম, সেই—

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥

দ্বীপিচর্ম্ম পরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।

অতি বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।

নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিত দিঙ্‌মুখা ॥

এস মা! এ দুর্দ্দিনে ডাকিতে হয় ত তোমাকেই ডাকি। এস মা! এলোকেশে রণবেশে, আমার হৃদয়সংগ্রামে এসে যোগ দাও। আমি যোড়করে ডাকি,—

করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।

রাশি রাশি কালমেঘে আমার হৃদয় ঘেরা, আমি মহামেঘবরণাকে ডাকি,—

মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।

সংসারসমরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতেছে, আমি রুধিররঙ্গিণীকে ডাকি,—

কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীং গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং।

রুধিরপানচিহ্নে যাঁহার বদনকমল চিহ্নিত, সেই শোণিতশোষিণীকে ডাকি,—

সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফূরিতাননাং।

জগৎ শ্মশান হইয়াছে, আর আমার হৃদয়শ্মশানেও চিরচিতানল জ্বলিয়াছে। অতএব এ শ্মশানরাজ্যে সেই শ্মশানবাসিনীকেই ডাকি,—

ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়সবাসিনীং।

এস মা শ্মশানরঙ্গিণী! ভূতপ্রেতসঙ্গিণি! সংহারকহৃদিবাসিনি! প্রলয়ের যা কিছু বাকী আছে, এইবার ক্ষিপ্রহস্তে তুমি সারিয়া লও মা। তোমায় দেখিয়েছি—

সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাং।

বামদিকের এক হাতে কৃপাণ, আর এক হাতে শুম্ভাসুরের ছিন্নমুণ্ড। তবে আর কেন? ঐ কৃপাণমণ্ডিত বাম হস্তখানি এই কয়টা মাথার উপর একবার ঘুরাইয়া লও, আর কয়েকটা নরমুণ্ড তোমার ঐ মুণ্ডমালায় যোজিত হউক। তোমার শোভা বাড়িবে, তোমাব ভূষণ ভাতিবে, তোমার ভক্ত ভজিবে—

দক্ষিণাং কালিকাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।

সর্ব্বনাশিনি! জগতের সৌন্দর্য্য ধ্বংস করিয়াছ, অসার জগৎ রাখিয়া আর ফল কি? কপালের মাঝে তিন তিনটা চক্ষু! নয়ন মেলিয়া কি দেখ না মা? তোমার ত্রিনয়নের পায়ে প্রণাম—

বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রিতয়ান্বিতাং।

শ্যামারূপে জগৎ ধ্বংস করিয়া আবার এ কি মূর্ত্তিতে দেখা দিলে মা! জগদ্ধাত্রী! জগৎ রসাতলে দিয়া আবার জগতে রাজত্ব করিতে আসিয়াছ! এই যে তোমায় দেখিতেছি—

সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং।

কেশরীর স্কন্ধে ভর করিয়া, সাপের পৈতা গলায় জড়াইয়া, এখানে কেন মা! তোমায় কে ডাকিল?

নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীং।

যাও মা ভবের ঘরণী! গৃহে যাও। নারদাদি দেবর্ষির তথায় তোমার পূজা করিবেন।

জগদ্ধাত্রীর পর আবার এ কে? নবকার্ত্তিক! দেব সেনাপতি! রণবেশ ছাড়িয়া, ফুটফুটে বাবুর বেশে

বাবুর দেশে বিলাসভোগ খাইতে আসিয়াছ। বেশ বেশ! ঢোলক তব্‌লায় খাসা বোলে বাঙ্গালী তোমায় খুশী করিয়া দিবে।

তাহার পর, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়, কালাচাঁদ আসিলেন রাসবিলাসে। মরুভূমে মদনকুঞ্জ সাজাইয়া, রসময়ের রাস-লীলা! ছি ছি ব্রজরাজ আর জ্বালাইও না। তোমার বৃন্দা-বন ভাঙ্গিয়াছে, তোমার কমলা বিদায় লইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়াছেন, তোমার ও বংশীরব আর কে শুনে বল? অতএব বংশীধর! তুমি ক্ষান্ত হও—

আর বাঁশী বাজাওনা শ্যাম!

এখানে আর তোমার রাসে কাজ নাই, দোলেও কাজ নাই। তুমি যে বল,—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

তোমার ভক্তবৃন্দ কোথায় তোমার নাম গায়, তুমি গিয়া খুঁজিয়া দেখ। এখানে কেন ঠাকুর! আমরা কেবল গোলে হরিবোল করি বৈ ত নয়।

উৎসব সব গেল, শেষ রহিল কেবল বসন্তের শ্রীপঞ্চমী। বাসন্তী পঞ্চমীর দিনে বীণাপাণির কি বিড়ম্বনা! সেই দিন আমি মনে মনে ভাবিলাম, মা ভারতি! আর কেন? কি সোহাগে আর এখানে আসিয়াছ? তোমার বেদ-বিদ্যা, তোমার সঙ্গীত-কলা সকলই ত আমরা ভাসাইয়া দিয়াছি। তোমার সহিত আর সম্পর্ক কি মা! তোমার বেদের শ্রাদ্ধ হইতেছে জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডে; আর তোমার সঙ্গীতের

শ্রাদ্ধ হইতেছে থিয়েটারে ও বারাঙ্গনার বিলাসকুঞ্জে। কেন তবে দেবি! এ শুষ্ক সরোবরের ছিন্ন কমলে ভর করিয়া বসিতে আসিলে ভারতি!

উৎসবের উল্লাসে আমায় উৎসাহিত করিতে পারিল না, পৃথিবীর কোলাহলে আমার বিকলচিত্ত বশীভূত হইল না। অন্তমনে, উদ্ভ্রান্ত প্রাণে, আমি দেশে দেশে ঘুরিতে লাগিলাম। কত তীর্থ পর্য্যটন করিলাম; কত নদ নদী, কত ভূধর প্রান্তর, কত কানন তপোবন, কত নগর জনপদ পরিভ্রমণ করিলাম, কোথাও শান্তির সাক্ষাৎ পাইলাম না। যাহা হারাইয়াছি, তাহার বিনিময়ে ভূমণ্ডলময় অন্বেষণ করিলাম; সে রত্ন, সে সৌন্দর্য্য, সে কান্তি, সে শোভা, সে দীপ্তি, সে মাধুরী, সে সুখ, সে তৃপ্তি জগতের আর কোন চিত্রেই দেখিতে পাইলাম না। জগতের কত চিত্র দেখিলাম, কত কাব্য পড়িলাম, সকলই রঙ্গহীন রসহীন বলিয়া প্রতিভাত হইল। জগৎ যেন অযত্ন-রক্ষিত উদ্যানের ন্যায়, প্রতিমাশূন্য চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিতে দুঃখ হয়; দেখিলে তৃপ্তি হয় না। মাথায় হাত দিয়া, বিরলে বসিয়া বসিয়া কত ভাবিলাম! হায় হায়! জগতের সৌন্দর্য্য কে চুরী করিল রে? প্রকৃতির প্রাণ কে হরণ করিল রে? সৃষ্টির মোহিনীশক্তি কে তুলিয়া লইল রে? সুষমার সারটুকু কে কাড়িয়া লইল রে? আমার মনে হইতে লাগিল, জগতের সেই সব আছে, কিন্তু একটা কি যেন নাই। চন্দ্রকিরণে সেই মাধুরী আছে, সুধা যেন নাই। প্রফুল্ল কুসুমে সৌরভ আছে, মধু যেন নাই। কোকিলের কলকণ্ঠে পঞ্চ-

যেব তান আছে, কিন্তু সেই কমনীযতা যেন নাই। তটি-নীব কলনাদে আবেশ আছে, কিন্তু উল্লাস যেন নাই। নির্ঝবের ঝঝব গীতে তানের কর্ত্তপ আছে, লয়ের সামঞ্জস্য যেন নাই। সঙ্গীতের সুধাধ্বনি গগণ ভেদিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু স্বরেব সহকারিতা তাহাতে যেন নাই। মনে মনে তর্ক কবিলাম, মনে মনে সন্দেহ করিলাম, বিশ্ববিধাতাব বিশ্ব-নির্ম্মাণ কৌশলে ধিক্। তাঁহাব এ বিশ্বনাট্যশালাব একটা উপকবণ অপহৃত হইল, সমগ্র সৃষ্টি অমনি অঙ্গহীন বলিযা বোধ হয় কেন? এ বিশাল বিশ্বযন্ত্রের একটা তন্ত্রী ছিঁড়িল ত অমনি অবশিষ্ট তারগুলা সকলেই বেসুবা বলে কেন? তর্কেব পব তর্ক উঠিল, আমাব চিত্তচূড়ামণি এইখানে থমকিযা দাঁড়াইলেন; কথা পড়িল যে, তন্ত্রী ছিঁড়িল কাব! বিশ্বযন্ত্রেব, না আমার হৃদযযন্ত্রেব? বেসুবা কে বলিতেছে, আমি না বিশ্ব? ভুল কাব, আমার, না বিশ্বচয়িতার? এইবাব বড় বিষম গোলে পড়িলাম। হরি হবি! ভুল কাব? আমাব, না ভালবাসাব? সৌন্দর্য্য কার চুবী গিযাছে? ভালবাসায় কাব আঘাত পড়িয়াছে? আমাব,—না জগতের? শ্রীহীন কে হইয়াছে, জগৎ,—না আমি? শ্রীহীনে আমাব এত হীনতা হইয়াছে? ভালবাসায় আমাকে এমন বিহ্বল কবিয়াছে? ভালবাসার এত তেজ, ভালবাসায এত ভুল, ভালবাসাব এত ভোগ! ভালবাসা কি তবে আমার শত্রু? হয হউক, শত্রু লইয়াই আমি ঘর করিব।

কিন্তু যাকে ভালবাসিতাম, যাকে ভালবাসি, যার ভাল-বাসা এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না, সে এখন

কোথায়? এ শূন্য ভালবাসা লইয়া, নিরবলম্বনে আর কতদিন বাঁচিব? তবে কি ভালবাসা একবারে ত্যাগ করিতে হইবে? ভালবাসার বৃত্তিটা হৃৎপিণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তবে কি তুলিয়া ফেলিব? হৃদয়ের স্তরে স্তরে, হৃদয়ের অণুতে অণুতে, যে ভালবাসা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহার বিচ্ছেদ কি সম্ভবে? তাহার মূল ধরিয়া টানিলে হৃৎপিণ্ড আপনি উপাড়িয়া আসিবে। শরীরের অস্থিমজ্জায়, পঞ্চভূতের প্রাণে প্রাণে, প্রাণের পরতে পরতে যে ভালবাসা মিশাইয়া গিয়াছে, তাহাও কি আবার বিসর্জ্জন করা যায়? ভালবাসা লইয়া তবে কি পাগল হইতে হইবে? যাহাকে ভালবাসিব, সে যখন নাই, এ ভালবাসার ভার তবে কোথায় ন্যস্ত করি? নিশীথ-নীরবে, ক্ষুদ্র এক তটিনীর তটে বসিয়া, নির্জ্জনে এই দুশ্চিন্তায় একদা আকুল হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময়, পরপার হইতে সমাগত একটা প্রণয়-গীতির ধ্বনি আমার কাণে বাজিল। কাণ পাতিয়া সে সঙ্গীত শুনিলাম। 'সে সঙ্গীত পুরাতন, কতবার তাহা শুনিয়াছি; কিন্তু আজ সেই পুরাতন গীতি নূতন হইয়া আমার হৃদয়ের মর্ম্ম স্পর্শ করিল, আমার হৃদয়ের চক্ষু ফুটাইয়া দিল। গায়ক পুনঃ পুনঃ পাল্টাইয়া গানটা গাইল। একাগ্রমনে আমি পুনঃ পুনঃ শুনিলাম—

যাবত জীবন রবে কারে ভাল বাসিব না।
ভালবেসে এই হলো, ভালবাসার কি লাঞ্ছনা॥
আমি ভাল বাসি যারে, সে কভু ভাবে না মোরে,
তবু কেন তারই তরে নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা।

ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভাল বাসে না ॥

গান শুনিয়া আমি বুঝিলাম, ঠিক কথা। ভালবাসা লইয়া আর পণ্ডশ্রম করিলে চলিবে না। যাহাকে ভালবাসিতাম সে যখন ছিল, তখন আমার ভাবনা ত একদিনও সে ভাবে নাই। নাই ভাবুক; কিন্তু এখন তাহার সন্ধান করিয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেও ত আর কোন ফল নাই। যে গিয়াছে সে ত আর ফিরিবে না। যাহা ভাঙ্গিয়াছে তাহা ত আর গোটা হইবে না। যাহা হারাইয়াছে, তাহা ত আর উদ্ধার হইবে না। মহাকাল যে বস্তু গ্রাস করে, তাহা ত আর উগারিয়া দেয় না। অতএব তাহার প্রতি যে ভালবাসা, সে ভালবাসা এখন ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। ব্যক্তিগত ভালবাসা লইয়া আর বৃথা কর্ম্মভোগ করা কেন? ভালবাসা কিছু একবারে ত্যাগ করিতে পারিব না। তবে এ ভালবাসার ভার কোথায় লইয়া ফেলি? তাহার পথ আছে। যে ভালবাসার ভার একজনের স্কন্ধে চাপাইয়াছিলাম, সেই ভালবাসা এখন ভাগ করিয়া ফেলা যাক্। ভালবাসাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, শত সহস্র, কোটি কোটি, অনন্ত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থে বিন্যস্ত করা যাক্। চেতনে অচেতনে, জড়ে উদ্ভিদে, নিখিল চরাচরে ভালবাসা বিলাইতে অভ্যাস করি। আমার ভালবাসার ভাগী একজনকে আর করিব না, সাত রাজার ধন কোন্ যক্ষকে চুরী করিয়া, আমায় ফকির করিয়া পলাইবে, সে পথে আর যাওয়া হইবে না। তবে এস ভাই! নর বানর, পশু পক্ষী,

কীট পতঙ্গ, মীন সরীসৃপ, স্থল জল, অন্তরীক্ষের যত প্রাণি-বৃন্দ, একে একে আসিযা আমার ভালবাসার ভাগ গ্রহণ কর। এস বৃক্ষ লতা, ফল কুসুম, শিলা মৃত্তিকা, সলিল বায়ু, অনল আকাশ, যে যথায আছ, আমার ভালবাসার অংশ লইযা আমার ভার লাঘব কর। সুন্দর অসুন্দর, নবীন প্রবীণ, পুণ্যাত্মা পাপী, কাহাকেও আমি বঞ্চিত করিব না, সবাই আসিযা আমার ভালবাসায ভাগ বসাও।

এখন জাগতিক পদার্থমাত্রে, এইরূপে ভালবাসা বিলাইয়া ব্যক্তিগত ভালবাসার দায হইতে আমি অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই অভ্যাসের নামই যোগসাধন। এ সাধনায আমি সিদ্ধ হইযাছি এমন কথা অবশ্য বলিতে পারি না। সিদ্ধি ভগবানের প্রসাদসাপেক্ষ। তবে এ কথা নিশ্চয করিযা বলিতে পারি যে, এই সাধনায আমি অনেকটা তৃপ্তি-লাভ করিযাছি, আমার মনের ভার অনেকটা লাঘব হই-যাছে। এ সাধনায আর একটা সুখ আছে, আর একটা মহদুপকার আছে। জগৎকে এইরূপে ভাল বাসিতে অভ্যাস করিলে জগৎপতির পদলাভ অনেকটা আযত্ত হইযা আসে। জগতের সহিত জগদীশ্বরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। জগতের প্রত্যেক পদার্থেই অব্যক্তভাবে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি নিজমুখেই বলিযাছেন—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

তিনি জগতে, আবার জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত রহিযাছে।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বাযুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয ॥

অধিক কি, জগতে তিনি ছাড়া ত আর কিছুই নাই; সূত্রগ্রথিত মণিসমূহের ন্যায়, সমগ্র জগৎ তাঁহার চরণে বাঁধা আছে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
মযি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

অতএব এই জগৎকে ভালবাসিতে যে শিখিবে, তার ভালবাসা জগদীশ্বরের চরণে অবশ্যই পহুঁছিতে পারে। যদি তাই হয়, তবে আমার এ ভালবাসাকে আমি ধন্য বলিয়া মানি। যে ভালবাসা, মর্ত্ত্যপ্রাণীকে লইয়া প্রেমময়ের চরণে উপনীত করিতে পারে; যে ভালবাসা, পৃথিবীর কলুষতাপ হইতে পৃথিবীপতির প্রসাদ-চ্ছায়ায় জীবকে সমাশ্রিত করিয়া দেয়, যে ভালবাসা, জগতের কামনা-জঞ্জাল, জগতের বিরহ-বিকার, জগতের বিদ্বেষ-বিলাস, জগতের মায়া-মোহ, জগতের দুঃখ-সন্তাপ হইতে চিরপরমানন্দের পথ জীবকে দেখাইয়া দিতে পারে; তাহারই নাম সার্থক ভালবাসা, বৈকুণ্ঠের ভালবাসা তাহাকেই ত বলিতে পারি। আমি ক্ষুদ্র হইয়াও সেই সাধুজন-বাঞ্ছিত ভালবাসার পথে পদার্পণ করিয়াছি। ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার ভালবাসার ইতিহাস, ইহাই আমার সন্ন্যাস। ভালবাসায় আমায় সন্ন্যাসী করিয়াছে; এখন সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, সন্ন্যাসেই আমার ভালবাসার সাধ যেন পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী বক্তৃতা শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে, সভাস্থল কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শ্রোতৃবর্গ বক্তার কথায় বিস্মিত বিচলিত হইয়া করতালি দিতে ভুলিয়া গেলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, বক্তৃতার জন্য আর কেহই প্রস্তুত নহেন দেখিয়া, সভাপতির শেষ কথা বলিবার জন্য আমি উত্থিত হইলাম। বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তবে সভাপতি হইয়া শেষটা দুকথা বলিয়া না দিলে নিতান্তই নাকি মান থাকে না, তাই অগত্যা সেই অবেলায় আমাকে আবার আসর লইতে হইল। আমি উঠিয়া বলিলাম,—

সভ্যগণ!—দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিল। এখন দুঃখের বিষয় এই যে, এই অপরাহ্ণকালে, আমার বক্তৃতানলে আপনাদিগকে আবার জ্বালাতন হইতে হইবে। যে সকল বক্তৃতা আপনারা শুনিয়াছেন, সে সকলের রীতিমত সমালোচন করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমার নাই। তবে বক্তৃতাগুলির সারসংগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদিগকে একবার শুনাইয়া দিলে বোধ হয় আপনারা আমায় অভিসম্পাত করিবেন না। কেবল সন্ন্যাসীর বক্তৃতা সম্বন্ধেই একটু বিশিষ্ট আলোচনার প্রয়োজন। অতএব সেজন্য অগ্রেই আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাখা ভাল। প্রথম বক্তা ব্রজরাজ

ভালবাসার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, স্ত্রৈণ-পুরুষ ও বিলাসিনী কুলকামিনীগণের অপযশ ঘোষণা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক আধুনিক শিক্ষার দোষেই হউক, আর যে কারণেই হউক, হিন্দু-সমাজে বিলাসের ব্যভিচার বড় বাড়িয়াছে, ভালবাসার স্রোত বিপথে বহিয়াছে; ভালবাসায় ধর্ম্মের ভাগ হ্রাস হইতেছে,—কামুকতার ভাগ, আত্মপরতার ভাগ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভালবাসা স্নেহ ভক্তির স্থান অধিকার করিতেছে, ভালবাসা সমাজের বিঘ্নাচরণ করিতেছে, ভালবাসা ধর্ম্মকর্ম্মের সহায় না হইয়া পরকালের পথে কণ্টকরোপণ করিতে বসিয়াছে। আমাদের সহধর্ম্মিণীকে আমরা এখন বিলাসের সহকারিণী করিয়া তুলিয়াছি। বন্ধু ব্রজরাজ, রহস্যের ভাষায় এই সকল উপদেশ দিয়া, উপসংহারে জ্ঞানমার্গ ও মোক্ষধর্ম্মের কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছেন। সে বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইলে, একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। প্রথম বক্তা তাহা করেন নাই, এবং আমিও এস্থলে তাহার আলোচনা করিব না। কেন-না, আমার কথার শেষভাগে, তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য বিচার করা আবশ্যক হইবে।

দ্বিতীয় বক্তা নবকুমার যে সমাজের ভালবাসা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, আমাদের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। হিন্দুসমাজ যাহার কোন সম্পর্ক রাখে না, হিন্দুসমাজের যাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সে বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামাইয়া কাজ কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন, নবকুমারের বক্তৃতা আমাদের না শুনিলেও চলিত। কিন্তু

আমি বলি, যাত্রায় সং না থাকিলে যাত্রার পালা অসম্পূর্ণ হয় না বটে, তথাপি কিন্তু সঙের প্রয়োজনীয়তা অনেকে স্বীকার করেন। অন্ততঃ নিতান্ত কুরুচির পোষক না হইলে সঙে অরুচি বড় কাহারও দেখা যায় না। অবসর বুঝিয়া সঙ সাজাইতে পারিলে, সঙে উপকারও যথেষ্ট হয়। এস্থলে নবকুমার নিজেই সঙ, বা সঙ সাজিয়া আসিয়াছেন, সে কথার বিচারে আমাদের কাজ নাই। বক্তৃতা লইয়াই আমাদের কথা; বক্তা লইয়া ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি?

তৃতীয় বক্তা, ডাক্তার মহাশয়। চিকিৎসকের চক্ষে ইনি ভালবাসার সমালোচনা করিয়াছেন। ইঁহার মতে, ভালবাসা এক বিষম ব্যাধি, উহার ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই। ভালবাসায় জগতের বড় অনিষ্ট হইতেছে। অতএব ভালবাসার চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করিতে হইবে, অথবা ভালবাসা সৃষ্টিসংসার হইতে একবারে নির্ম্মূল করিতে পারিলেই ভাল হয়। ডাক্তার মহাশয়ের কথায় অনেকের ধোঁকা হইতে পারে। তাঁহার ভাষাটা কিছু দোভাষা রকমের। ব্যঙ্গোক্তির সঙ্গে মর্ম্মকথা এম্নি মিশান আছে যে, স্থলে স্থলে সে দুয়ের তারতম্য করা যায় না। ডাক্তার বাবু ভালবাসার শত্রু, কি ভালবাসার মিত্রপক্ষ, সহজে তাহা অনুমান করা যায় না। সে অনুমানে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই; আর আমার নীরোগ শরীর, ডাক্তার বাবুকেও এখন আমার কোন প্রয়োজন নাই। এখন প্রয়োজন তাঁহার বক্তৃতা লইয়া। ডাক্তার মহাশয় স্বয়ং ভালবাসার শত্রু হউন বা না হউন, এজগতে ভালবাসার

শত্রু বাস্তবিক কেহ আছে কি না, তাহা দেখা উচিত। আমার মতে, ভালবাসার শত্রু যদি কেহ থাকে, তবে তাহাদের সংখ্যা অতি সামান্য, এবং তাহারা হয় বাতুল, নয় ভণ্ড। ভালবাসায় মন্দের ভাগ আছে বলিয়া, ভালবাসার অপব্যবহারে, ভালবাসার ব্যভিচারে ভালবাসাকে লোকে মন্দ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া, যে ভালবাসার শত্রুতাচরণ করিতে চায়, তাহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলিব? মধু অধিক পরিমাণে খাইলে বুক জ্বালা করে বলিয়া কি মধুকে অপদার্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হইবে? যে অন্ন জীবের প্রাণধারণের উপাদান, অতিরিক্ত ভোজন করিলে, অসময়ে বা অনুচিতকালে ভোজন করিলে, তাহাই আবার রোগের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই বলিয়া কি অন্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে? ভালবাসার শত্রু বলিয়া যাহারা ভাণ করে তাহারা বুঝে না যে, ভালবাসা বিলুপ্ত হইলে জগতের অস্তিত্বই সম্ভবে না। ভালবাসা না থাকিলে সংসার থাকে না, সমাজ থাকে না, মনুষ্যত্ব থাকে না, জীবের জীবত্ব থাকে না; ভালবাসা না থাকিলে জীবের জন্ম হয় না, সন্তানের পালন হয় না, সংসারের ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না। এই যে মানবদেহ, এই যে পঞ্চভূতে মিশামিশি, এই যে জড়ের গঠন, এই যে উদ্ভিদরাজ্য, এই যে জীবসমষ্টি, এই যে অচেতন সৃষ্টি, ভালবাসা না থাকিলে, অণুতে অণুতে আনুগত্য না থাকিলে, এ সকলের অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে? সৃষ্টির এ আকার কিসের উপর তিষ্ঠিবে? ভালবাসাই জগতের মূলগ্রন্থি, ভালবাসাই প্রকৃতি, ভালবাসাই ভগবানের সৃষ্টি-

কামনাসম্ভূত অপূর্ব্বশক্তি। এই ভালবাসা ধ্বংস করিয়া সৃষ্টি রাখিবার কল্পনা যে করে, সে ঘোর মূর্খ, ঘোর ভণ্ড, ঘোর নাস্তিক। এই শ্রেণীর বর্ব্বরগণকে বিদ্রূপ করাই বোধ হয় ডাক্তার মহাশয়ের উদ্দেশ্য। তাঁহার ব্যঙ্গোক্তির আবরণমধ্যেও ভালবাসার চিত্র যেরূপ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, রহস্যের আবরণ ভেদ করিয়া সে চিত্র যেরূপ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাতে ভালবাসাকে তিনি যে একটা অসার সামগ্রী বলিয়া, তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন, ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে কখনই তাহা বোধ হয় না। ভালবাসা ব্যাধি নয়, ভালবাসাই জগতের সঞ্জীবনী সুধা। অমৃতে যার গরলভ্রান্তি, অমৃতে যার গরল উঠে, তার অদৃষ্ট বড় মন্দ।

চতুর্থ বক্তা, শিশিরকুমার। নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভাব জগতে বড় বিরল, ইহাই ইঁহার বক্তৃতার সার কথা। যে কেহ ভালবাসে, ভালবাসা যত রকমের আছে, সকলেরই গোড়ায় একটা না একটা স্বার্থসাধনের অনুরোধ আছে। যতক্ষণ স্বার্থের আশা, ততক্ষণই ভালবাসার অস্তিত্ব। স্বার্থের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হইলেই ভালবাসারও অস্তিত্ব লোপ হয়, স্বার্থ সিদ্ধ হইলে স্থলবিশেষে ভালবাসা শত্রুতায় পরিণত হয়। এই সকল তত্ত্ব কতক কতক দৃষ্টান্ত দিয়াও শিশিরকুমার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শিশিরকে লইয়াও অনেকের বুদ্ধিভ্রম হইতে পারে। অনেকেই মনে করিতে পারেন, শিশির বুঝি নিজে নিঃস্বার্থ ভালবাসার বিরোধী। আমি আবার বলি, শিশিরকে লইয়া টানাটানি করিবার প্রয়োজন

কিছুমাত্র নাই। তিনি নিজে যে কোন ভালবাসার চর্চ্চা করুন না কেন, যে ক্ষেত্রেই বিচরণ করুন না কেন, তাঁহার কথা লইয়াই আমাদের কাজ, তাঁহার চরিত্র লইয়া, তাঁহার গোপনীয় বিশ্বাস লইয়া আমাদের ফল কি? নিঃস্বার্থ ভালবাসাই যে শ্রেষ্ঠ ভালবাসা, নিস্বার্থ ভালবাসাই যে প্রকৃত ভালবাসা পদের বাচ্য, তাহা শিশিরের বক্তৃতাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বক্তা যে ভাবে জনকনন্দিনী সীতা ও সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণের ভালবাসা চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারাই যে জগতে নিঃস্বার্থ ভালবাসার চরম নিদর্শন, এ কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ব্যঙ্গচ্ছলে সীতা সৌমিত্রির দোষঘোষণা—ব্যাজস্তুতি অর্থাৎ নিন্দাচ্ছলে গুণ-কীর্ত্তন বলিয়াই বোধ হয়। যদি তা না হয়, যদি বক্তা ব্যঙ্গ না করিয়া, সত্য সত্যই সীতা-সৌমিত্রির ভালবাসার বিরোধী হন, তবে তিনি নিজেই বিদ্রূপের পাত্র, তাঁহার মর্ম্মকথা প্রকাশ করিতে গিয়া, প্রকারান্তরে, তাঁহার দ্বারা সত্যের সম্মানই সংরক্ষিত হইয়াছে।

পঞ্চমে আসর লইয়াছেন শর্ম্মা রসিকরঞ্জন। রসিক-ভায়া আসর লইয়া আসর মাৎ করিয়াছেন বটে। রসিকের সহিত কাহারই বিরোধ নাই, বিরোধ হইতেই পারে না। ভালবাসায় তাহার গাঢ় অনুরাগ। ভালবাসার ভাল ভাগটা, তিনি যত ভাল কথায় পারিয়াছেন, সাধ্যমত তুলনায় বর্ণনা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু, ভালবাসায় যে বিভীষিকা আছে, তাহা হইতে সমাজকে সাবধান করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে সঙ্কেতে বলিয়া দিয়াছেন, ভাই!

কুসুমে কীট আছে, উদ্যানে কণ্টক আছে, শশাঙ্কে কলঙ্ক আছে, মোদকে অম্বলের সম্ভাবনা আছে, অমৃতেও গরলের আশঙ্কা আছে। অতএব সাবধানে থাকিও, সাবধানে চলিও। শাস্ত্রেও বলিয়াছে—

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥

ভালবাসার গুণবর্ণনায় রসিকের কোন ত্রুটি নাই। সকল উপমা শেষ করিয়া, তিনি অবশেষে, আপনার মাথার মণি যে গৃহিনী, তাঁহাকে লইয়াও টানাটানি করিতে ছাড়েন নাই। গৃহিণীর প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া রসিকরঞ্জন মাঝখানটায় একটু গ্রাম্যতাদোষে বক্তৃতাটি কলঙ্কিত করিয়া অবশেষে মধুররসেই সমাপন করিয়াছেন বটে। রসিকের সেই দোষটুকু, চাঁদের সেই কলঙ্কটুকু, তুমি আমি সহ্য করিলেও, সকলে ক্ষমা করিবেন কি না তা জানি না।

ষষ্ঠ বক্তা আমার অপরিচিত; তাঁহার নিকট বোধ হয় আমি অপরাধী হইয়াছি। তাঁহার বক্তৃতা সবে আরম্ভ হইতেছিল, কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে সে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। যে রাজ্যের ভালবাসা লইয়া তিনি আলোচনা করিতে উঠিয়াছিলেন, তাহা অপবিত্র, পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ। তাঁহার উদ্দেশ্য কি ছিল, ব্যঙ্গ কি বাহাদুরী, তাহা জানি না; কিন্তু ব্যঙ্গ হইলেও তাহা পরিহার্য্য; সে ভালবাসা লইয়া ভালবাসার নাম কলঙ্কিত করা ভদ্রলোকের কদাচই উচিত নহে। নরকের আবার ব্যঙ্গ কি? ব্যঙ্গ বিদ্রূপের একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। যে পাপচ্ছবি বাহ্যদৃশ্যে আপাততঃ সুন্দর

বা সুখকর বলিয়া অবোধের চক্ষে প্রতীয়মান হয়, তাহার অভ্যন্তরভাগ যে বিষময়, পরিণামে তাহা যে হলাহল প্রসব করে, এই তত্ত্ব রঙ্গরসের উজ্জ্বলচিত্রে প্রতিফলিত করাই ব্যঙ্গরচনার প্রধান উদ্দেশ্য। পাপে যাহাতে ঘৃণা হয়, সেই ভাবে পাপচিত্র প্রতিফলিত করাই চিত্রকরের নৈপুণ্য। কিন্তু তাই বলিয়া সকল স্থলেই কি সেই চিত্র আঁকিতে হইবে? যেখানে গোলাবের সৌগন্ধ প্রদর্শন করিতেছ, তথায় নরকের কৃমিকীটময় পুরীষ-প্রণালী আলোড়ন করিয়া, তাহার দুর্গন্ধের সহিত তুলনা করিয়া কি কুসুমের আপেক্ষিক সৌন্দর্য্য বুঝাইতে হইবে? গোলাবের সহিত বেল মল্লিকা, টগর কলিকা, শিমূল পারুলের পার্থক্য দেখাইতে পারি। গলিত তৃণের গন্ধে তুলনা করিয়া গোলাবের গর্ব্ব বাড়িবে কি? স্বর্গের বর্ণনায় নরকের তুলনা কেন? পৃথিবীর উপব স্বর্গের শ্রেষ্ঠতা দেখাইলেই যথেষ্ট হইল। নরক আপনার দুর্গন্ধে, আপনার বীভৎস রসে আপনি ন্ধকারজনক হইয়া আছে, তাহার দৃশ্য স্বর্গদৃশ্য বলিয়া কদাচই ভ্রম হইতে পারে না। এমন নির্ব্বোধ ভ্রান্ত যদি কেহ থাকে, তাহার জন্য সাহিত্যকারের কষ্ট করা পণ্ডশ্রম মাত্র। অপরিচিত বক্তাকে এই জন্যই আমি নরক ঘাঁটিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। যদি অসৌজন্য হইয়া থাকে, বোধ হয় তিনি এইবার বুঝিয়া ক্ষমা করিতে পারেন।

সপ্তম ও শেষ বক্তা স্বয়ং সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর বক্তৃতা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভালবাসার ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় ভাগে হতাশা-জড়িত আত্মপ্রণয়ের ইতিহাস। বক্তৃতাব

প্রথমাংশে আমার বলিবার কথা কিছুই নাই, দ্বিতীয়ভাগে বক্তব্য বিলক্ষণ আছে। বক্তৃতার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসীর আকার ইঙ্গিত দেখিয়া, সন্ন্যাসীর ভাবভক্তি বুঝিয়া আমরা যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, এখন সেই সন্দেহই সার্থক হইল। সংসারের একটা প্রবল ঝটিকা যে ইহাঁর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তুফানে পড়িয়াই যে ইনি কূল হারাইয়াছেন, আমাদের এই সন্দেহ এখন সমূলক বলিয়া উহাঁর নিজের কথাতেই প্রতিপন্ন হইল। সন্ন্যাসী ঘোর প্রেমিক, ভাল-বাসার ক্রীতকিঙ্কর। কিন্তু সংসারে ভালবাসার সাধ ইহাঁর পূর্ণ হয় নাই। প্রণয়পাত্রী বিদ্যমান থাকিতেও ইহাঁর প্রণয়পিপাসা মিটাইতে পারেন নাই। ইনি ভালবাসিতেন, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াও সে ভালবাসার প্রতিদান পাইতেন না বলিয়া মরমে মরিয়া ছিলেন। কথা কিছু বিচিত্র নয়। কার এমন হয় না? ভালবাসা যতই নিঃস্বার্থ হউক, প্রতিদান না পাইলে নিঃশ্বাস না ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকে এমন সংসারী কে কোথায় দেখিয়াছ! যে প্রতিদান চায় না, যে বলে—

> ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
> আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥

সঙ্গে সঙ্গে হতাশের তপ্তশ্বাস কি তাহার বহে না? তবে তাহার ভালবাসাকে নিঃস্বার্থ বলি কেন, তাহার ভালবাসাকে প্রথম শ্রেণীর ভালবাসা বলি কেন? তাহার কারণ আছে। প্রতিদান পাইল না বলিয়া তাহার ভালবাসায় কখন ত্রুটি হইবে না, তাহার ভালবাসা কখনও হ্রাস হইবে না। যাকে

ভালবাসি সে যদি আমায় দেখিতে পারিত, সে যদি আমায় কোলে লইত, তাহা হইলে ত হাতে স্বর্গ পাইতাম। হাতে হাতে স্বর্গলাভ আমার অদৃষ্টে নাই, অতএব স্বর্গের ধ্যান করিয়াই আমি ইহজীবনে স্বর্গসুখ অনুভব করিব। ইহারই নাম উৎকৃষ্ট প্রণয়, ইহারই নাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা। সীতা সাবিত্রী এই ভালবাসার আদর্শরূপিনী। পতিপরিত্যক্তা সীতা বনবাসে বিসৃষ্টা হইয়াও দেবরসমীপে বিদায় লইয়া বলিতেছেন, "দেখো বৎস! আর্য্যপুত্রের যেন কোনরূপ কষ্ট না হয়। আর তিনি গৃহিণীপদবী হইতে আমাকে বিসর্জ্জন করিলেন; কিন্তু তিনি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, তাঁহার রাজ্যমধ্যে আমিও একজন প্রজা, এটা যেন তাঁহার মনে থাকে। আমি এই বনে বসিয়াই যাবজ্জীবন তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরে তাঁহাকেই আবার পতিরূপে প্রাপ্ত হই।" বিনাদোষে বিসৃষ্টা হইলেও, রামচরণে সীতার ভক্তি অচলা। কিন্তু তাই বলিয়া, পতিপ্রসাদলাভে বঞ্চিতা হইয়া কি সীতার শোণিতাশ্রু বক্ষ ফাটিয়া প্রবাহিত হয় নাই? সত্যবানের পরমায়ু ফুরাইয়াছে জানিয়াও, সাবিত্রী তাঁহার চরণে চিত্তসমর্পণ করিলেন। সাবিত্রী নিঃস্বার্থ প্রেমের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। সাবিত্রী সতীকুলশিরোমণি। কিন্তু তাই বলিয়া কি সাবিত্রী সত্যবানের বিয়োগদুঃখে কাতরা নহেন? প্রাণান্তপণে ভালবাসিয়া, ভালবাসা ভোগ করিবার লালসা কাহার চিত্তে সমুদিত হয় না? ভালবাসায় বঞ্চিত হইলে বাড়বানলপ্রবাহের তপ্তধারা কাহার চিত্তে প্রবাহিত হয় না? সীতা সাবিত্রী প্রণয়রাজ্যের দেবতাস্বরূপিনী।

তোমার আয়েষা বল, রেবেকা বল, সকলই এই দেবতার ছাঁচে ঢালা। সকলেই নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শভূতা, কিন্তু অতৃপ্ত প্রণয়ের অন্তর্দ্দাহে বিদগ্ধা।

আমাদের সন্ন্যাসীর দশাও ঠিক তাই। প্রণয়পাত্রী যতদিন ছিল, ততদিন ইনি হতাশার বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও, অসহ্য অনলদাহে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়াও, কোনমতে আত্মসংযম করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রণয়পাত্রীকে হারাইয়া ইনি আর চিত্তের বন্ধন সংযত করিয়া রাখিতে পারিলেন না। সকল বন্ধন তখন একবারে শ্লথ হইয়া পড়িল। অঙ্গ অবশ, চিত্ত অধীর, বুদ্ধি বিহ্বল, মস্তিষ্ক তরল, প্রাণ উদাসীন হইয়া পড়িল। উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত চিত্তে, অতীত দুঃখের স্মৃতি লইয়া, ভগ্নপ্রণয়ের পিপাসা লইয়া, অসম্পূর্ণ সুখের মায়া লইয়া, অতৃপ্ত বাসনার ছায়া লইয়া, বিরাগ বিরক্তির দায়ে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিলেন। কালসহকারে, বুদ্ধি চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদন হইলে, ইনি মনে করিলেন, সন্ন্যাসেই ইঁহার রোগের প্রতিকার হইবে; মনে করিলেন, প্রিয়জনের প্রেমোচ্ছ্বাস পৃথিবীময় ঢালিয়া দিয়া অন্তরের ভার লাঘব করিবেন; অতৃপ্ত বাসনার বেগ সংসারের বাহিরে বিসর্জ্জন করিয়া, মমতার মোহমন্ত্র হইতে মুক্ত হইবেন।

কাজটা বড়ই ভুল হইয়াছে। এইখানেই আমার আপত্তি, এইস্থলেই সন্ন্যাসীর সহিত আমার ঘোরতর মত-বিরোধ। যাহা অসাধ্য, যাহা অসম্ভব, তাহার সাধনা করিতে যাওয়া, সন্ন্যাসীর মত বুদ্ধিমান জীবের উচিত হয় নাই। বাসনার বোঝা বুকে বহিয়া কি সংসারসাগর পার

হওয়া যায়? সংসারের সাধ না মিটিলে কি সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায়? পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, অনশনব্রত কি সেই সময় অবলম্বন করা যায়? সকলেরই সময় আছে, সকলেরই সীমা আছে। সময় লঙ্ঘন করিয়া, সীমা অতিক্রম করিয়া, অসম্ভবের আরাধনা করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে কেন? তাও কি কখনও হয়? তাহা হইলে শাস্ত্র মিথ্যা হইবে, সৃষ্টি বিপর্য্যস্ত হইবে। এ সুখের সংসার ভগবান কি বৃথায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন! কিসের জন্য সংসার, কিসের জন্য গৃহস্থাশ্রম, কিসের জন্য মানবজীবন? সংসারধর্ম্ম পালন না করিয়া মানুষ অরণ্যাশ্রয়ী হইবে, সৃষ্টিকর্ত্তার এমন অভিপ্রায় নয়, শাস্ত্রকারের এমন উপদেশ নয়। শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট ভগবানের অভিপ্রেত এই যে মানুষ জন্মিবামাত্রই গৃহী হয়, অতঃপর শাস্ত্রীয় সংস্কারে পূত হইলে তাহাকে আশ্রমী বলা যায়। অতএব মানব প্রথমাবস্থায় যথাবিধি গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিবে।

> জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
> গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি॥

তন্ত্রের এই মহতী উক্তি পার্ব্বতীর প্রতি মহাদেবের উপদেশ বলিয়া কথিত আছে।

গৃহে থাকিয়া গৃহস্থকে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে ইহাই ভগবানের আদেশ, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। এখন বুঝিয়া দেখুন, সংসার কাহাকে বলে, সংসারধর্ম্ম কিরূপে পালন করিতে হয়, আর পালন করিলেই বা কিরূপ ফললাভ করা যায়। সংসারের দুই মূর্ত্তি। সংসার বিলাস-

ভোগের নিকুঞ্জকানন ; আবার সংসারই তত্ত্বজ্ঞান সাধনের পবিত্র তপোবন। সংসারের অধিষ্ঠাত্রী সংসারলক্ষ্মীরও সুতরাং দুই মূর্ত্তি। গৃহিণী সংসারমায়ার রজ্জুরূপিণী, আবার গৃহিণীই আমাদের তত্ত্বজ্ঞানলাভের সহধর্ম্মিণী। এই মায়াময়ীকে লইয়া মায়াপাশ ক্রমশঃ ছিন্ন করিতে হইবে; বিলাসিনীর বসনাঞ্চল ধরিয়া বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে; আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া, সন্তরণকৌশলে, অনন্ত-ভবসাগর পার হইয়া যাইতে হইবে। সাঁতারের এই ত রীতি। গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইও, কিন্তু সাবধান! মাথা ডুবাইয়া যেন মাথাটি খাইও না। নাক মুখ চক্ষু অবশ্যই জাগাইয়া রাখিতে হইবে। আর এক কথা, পঙ্কে পা দিও না। পাপপঙ্কে পা পড়িলে, পঙ্কে ডুবিতে আরম্ভ করিলে, আর উঠিতে পারিবে না। সাঁতার সেখানে চলিবে না!

সংসার বড় বিচিত্র স্থান। সংসাররহস্য বুঝিয়া যিনি সাবধানে চলিতে পারেন, তিনিই সংসারী। বুঝিবার বুদ্ধি যাঁহার নাই, শাস্ত্র তাঁহার সহায়, সমাজ তাঁহার নেতা, দৃষ্টান্ত তাঁহার আদর্শ। যদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে চাও, যদি সংযম অভ্যাস করিতে চাও, যদি ভালবাসার প্রসর বৃদ্ধি করিতে চাও, যদি বিশ্বপ্রেমিক হইতে চাও, যদি হৃদয়মধ্যে ভগবদ্ভক্তির বীজরোপণ করিতে চাও, তবে সংসারই তাহার উপযুক্ত শিক্ষালয়। মানুষ স্বভাবতঃই ভোগাভিলাষী, মানুষ কামনার দাস। সংসারে থাকিয়া, নিয়মমত, যেটুকু আবশ্যক, যেটুকু বিহিত, সংসাররক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন,

সেই পরিমাণে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে সংযম অভ্যাস করিতে শিখিবে। উদ্দাম হৃদযের দুরন্ত বাসনা, সংযমের লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। প্রলোভনের শতমধ্যস্থলে থাকিয়াও এই আত্ম-সংযম তোমায় অভ্যাস করিতে হইবে। সেই শিক্ষাই ত প্রকৃত শিক্ষা।

বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে।
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥

অরণ্যে এ শিক্ষার উপায় নাই, ইহার প্রকৃত স্থান সংসার। সংসার প্রলোভনময়। সেই প্রলোভনের মাঝে থাকিয়াই লোভসম্বরণ অভ্যাস করিতে হইবে। আর শিক্ষাকার্য্যে, সংসারে তোমার সহায় কত? শাস্ত্র ভ্রূকুটী করিতেছেন, সমাজ সহস্র চক্ষে চাহিয়া আছেন, গুরুজন দণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, বান্ধবে হিতচেষ্টা করিতেছেন, আর স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী অমৃতালাপে অভিষিক্ত করিতেছেন। অরণ্যে তোমার কে আছে ভাই?

ভালবাসার প্রসর বৃদ্ধি করিবার এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র সংসারের মত আর কোথায় পাইবে? গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সন্তানের স্নেহ, প্রেয়সীর প্রীতি, বান্ধবের মিত্রতা, কুটুম্ব স্বজনের সম্বর্দ্ধনা, প্রতিবেশীর সদালাপ, অতিথি অভ্যাগতের আদর, দীনদুঃখী, ভিক্ষুক যাচকের প্রতি দয়া এ সকলের চর্চ্চা অরণ্যে কোথায় করিবে? সংসারক্ষেত্রে, এক ভালবাসা, কত প্রকারে বিস্তৃত, কতদিকে প্রচারিত সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে দেখুন। স্মধু তাই নয়। হিন্দুর আবার এম্‌নি নিয়ম, এম্‌নি বিধিব্যবস্থা যে, জীব জন্তু, পশু

পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ শিলা, সলিল আকাশ, বায়ু বহ্নিকেও পূজা করিতে হইবে, দেবতা জ্ঞানে নমস্কার করিতে হইবে। গৃহস্থ পশু পালন করে, প্রাণের ভক্তি দিয়া; নবান্নের দিনে সর্ব্বভূতে অন্নদান না করিয়া আপনি ভোজন করে না। বিশ্বপ্রেম শিখিবার এমন সুবিধান আর কোথায় আছে বল দেখি?

কিন্তু বিশ্বেশ্বরকে না চিনিলে ত বিশ্বপ্রেম শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। জগৎ যাঁহার রাজ্য, জগতের যিনি অধীশ্বর, জগৎ যাঁহার দেহ, জগতের যিনি জীবন; সেই জগদীশ্বরকে ভালবাসিতে না শিখিলে জগৎপ্রেম পরিবর্দ্ধিত হইবে কেন? সংসারে সেই ভগভক্তি শিক্ষাব বিধান ত প্রতিপদেই আছে। গর্ভাধান হইতে চিতারোহণ পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় সংস্কারে পূত হইতে হইবে। দেহান্তেও পিণ্ডাধিকারীর হাতে আত্মার মঙ্গলবিধান হইতেছে। আর জীবিতকালে, জ্ঞানোদয় হইতে না হইতে দেবতার চরণে প্রণাম করিতে হইবে, অন্তিমে "গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম" বলিয়া তনুত্যাগ করিতে হইবে। সংসারী প্রতিপদে, প্রতি কার্য্যে, প্রতিদিন, প্রতিপর্ব্বে, প্রতিদণ্ডে, প্রতিনিঃশ্বাসেই কোন না কোন প্রকারে দেবতার চরণে শরণ লইবে। প্রভাতে জাগরিত হইবে দেবতার নাম লইয়া, রাত্রিকালে শয়ন করিবে দেবতার চরণে প্রণাম করিয়া। নিদ্রিত হইয়াও নিস্তার নাই। দৈবাৎ যদি স্বপ্ন দেখত অমনি "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং।" এই গেল নিত্যকর্ম্ম। ইহা ভিন্ন শ্রাদ্ধ শান্তি, ব্রত নিয়ম, জপ হোম, পূজা, উৎসব, যাগযজ্ঞ, দানধ্যান, স্বস্ত্যয়ন পুরশ্চারণ প্রভৃতি অসংখ্য অনন্ত

ক্রিয়াকলাপ কিসের জন্য অনুষ্ঠিত হয়? কাহার চরণে উৎসর্গ হয়? দেবভক্তি শিখিবার এমন সুন্দর রীতি হিন্দুর সংসার ছাড়া আর কোথায় আছে?

এইরূপে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে করিতে সংসারে ভালবাসার চর্চ্চা করিতে করিতে, তোমার হৃদয় উদার, তোমার ধারণাশক্তি সম্প্রসারিত হইয়া আসিবে। কেবল ব্যক্তি-বিশেষকে ভালবাসিয়া, কেবল স্বজন-বান্ধবকে ভালবাসিয়া তোমার আর তৃপ্তি হইবে না। সংসারের ভোগবাসনা তৃপ্ত হইলে, সাংসারিক ভালবাসার সাধ পূর্ণ হইলে, শেষদশায়, বিশ্বসংসারকে ভালবাসিবার জন্য তোমার হৃদয় ব্যগ্র হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবে যে বিশ্বেশ্বরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ-স্বরূপ। তিনিই সব, তাঁহার সব। সংসার অনিত্য, সংসার মিথ্যা। ইহজগৎ থাকুক আর না থাকুক, তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার স্বত্বা চিরবিরাজমান। সংসার শোকদুঃখে, মায়া-মোহে, মিথ্যা প্রপঞ্চে অভিভূত। জগতে একমাত্র সত্যবস্তু তিনি। তাঁহার নাশ নাই হ্রাস নাই বিষাদ নাই; বিচ্ছেদ নাই। অতএব তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিলেই ভালবাসার চরমসীমায় উপনীত হওয়া যায়, ভালবাসার উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে চরিতার্থ হয়। তাঁহাকে ভালবাসিলে ভালবাসার অভাব থাকিবে না, ভালবাসায় কখনও বঞ্চিত হইতে হইবে না, ভালবাসা অতৃপ্ত থাকিবে না, ভালবাসায় বিরহতাপের সংস্পর্শ থাকিবে না, ভালবাসায় হ্রাস বৃদ্ধির শঙ্কা থাকিবে না, ভালবাসিতে আর কাহাকেও বাকী থাকিবে না। জগতে তিনি ছাড়া ত আর কিছুই নাই। জগতের সর্ব্বত্রই

তিনি ওতপ্রোত হইয়া আছেন। জগৎ তাঁহারই সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। জগৎ তন্ময়।

আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

ইহারই নাম তত্ত্বজ্ঞান। বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানবের মনে এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। সংসারভোগের বাসনা হইতে বিরতির নামই বৈরাগ্য। ভোগতৃষ্ণার লেশমাত্র যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ কদাচই প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইবে না। সংসারভোগ করিতে পাইলাম না বলিয়া, আক্ষেপ করিয়া যিনি সংসার ত্যাগ করেন, তাঁহার সে ত্যাগ বৈরাগ্যজনিত নহে। সংসারভোগের সাধ যাঁহার মিটিয়াছে, সংসারে স্পৃহার লেশমাত্র যাঁহার নাই, সংসার ত্যাগে যাঁহার কোন কষ্টই নাই, সেই ব্যক্তিরই প্রকৃত বৈরাগ্য হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বৈরাগ্য সমুদিত হইলে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। শাস্ত্রে তাহার বিধান আছে—

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥

কিন্তু শাস্ত্র বড় উদার, শাস্ত্র বড় বিচক্ষণ। শাস্ত্র সাবধান করিতেছেন, তুমি কেবল আপনার পথ চাহিলে চলিবে না। তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেও, সংসারকে কাঁদাইয়া তুমি যাইতে পাইবে না। গৃহে যদি তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতা থাকেন, পতিব্রতা প্রণয়িনী থাকেন, অপ্রাপ্তবয়া পুত্র

থাকে, তবে তাহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেলে তুমি ঘোর পাতকী হইবে। অধিক কি স্বজন বন্ধুর মনে কষ্ট দিয়াও তুমি যাইতে পাইবে না।"

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ॥
মাতৄঃপিতৄন শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি।
যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ॥

এ সকল বাধা যদি তোমার থাকে, তবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেও, গৃহে বসিযাই তুমি আপনাব কর্ম্মসাধন কর। যিনি জ্ঞানী, যিনি নিষ্কাম, যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি গৃহে থাকিলেও সন্ন্যাসী। আর যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, ইন্দ্রিয়জয় হয় নাই, বাসনার লয় হয় নাই, বনে বনে ভ্রমণ করিলেও তিনি ঘোর সংসারী। জনকাদি রাজর্ষিরা গৃহে থাকিয়াও প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম্মী ছিলেন। আর আজিকার কালে এই যে নাগা ফকির, সাধু সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব বাউল, ন্যাড়া নেড়ী, ভৈরব ভৈরবী গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ ও গাঁজার শ্রাদ্ধ করিতে থাকে; ইহারা সংসারের দাস, অর্থের দাস, উদরের দাস, কামনার আজ্ঞাকারী অনুগত কিঙ্কর বৈ ত নয়। যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী, যিনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, নর-দেহেই তিনি জীবন্মুক্ত। পুণ্যফলেই ঈদৃশ সাধুর দর্শন পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবলে সাধু-দর্শন হইলে, শাস্ত্র বলেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিবে।

কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ॥

সন্ন্যাসী হও না কেন ভাই! সন্ন্যাসী হইতে কে নিষেধ করিতেছে? সন্ন্যাসের বিধান শাস্ত্রেই ত আছে। আগে যোগ্য হও, তবে যাজন করিও। ইংরেজীতেও একটা কথা আছে—First deserve, then desire. যদি যোগ্য হইয়া থাক, যদি সময় হইয়া থাকে, শাস্ত্রোক্ত উপরিকথিত কোনরূপ বাধা যদি না থাকে, তবে শাস্ত্রীয় বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া সচ্ছন্দে সংসার ত্যাগ কর। ঘর সংসার গুছাইয়া দিয়া, স্বজন বন্ধু, প্রতিবাসী গ্রামবাসী, এমন কি পর যে শত্রু তাহাকেও পরিতুষ্ট করিয়া, তাহাদের অনুমতি লইয়া, পরমদেবতাকে প্রণাম করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নির্ম্মম, নিষ্কামচিত্তে জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইবে।

সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মাণি পরিতোষ্য পরানপি।
নির্ম্মমো নিলয়াদ্গচ্ছেন্নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
আহূয় স্বজনান্ বন্ধূন্ গ্রামস্থান্ প্রতিবাসিনঃ।
প্রীত্যানুমতিমন্বিচ্ছেৎ গৃহান্নির্গমিষুর্জ্জনঃ॥
তেষামনুজ্ঞামাদায় প্রণম্য পরদেবতান্।
গ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষো গৃহাদিয়াৎ॥

শাস্ত্রের এই বিধানে বিশ্বপ্রেমের কি বিচিত্রচ্ছবি চিত্রিত হইয়াছে দেখুন। সংসারে বৈরাগ্য হইয়াছে বলিয়া, সংসারকে যেন দ্বেষ করিও না। যিনি সংসারদ্বেষী, তিনি আবার কিসের প্রেমিক? সংসারদ্বেষী বলিয়া ত তিনি সংসার ত্যাগ করিতেছেন না; কেবল আপনার সংসারকে ভালবাসিয়া তখন আর তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না বলিয়া

তিনি সংসারের বাহিরে যাইতেছেন। সমগ্র বিশ্বসংসারকে তখন তিনি আপনার বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাই—বিশ্বময় বিচরণ করিবার জন্য তিনি বহির্গত হইতেছেন।

সমগ্র বিশ্বসংসার তাঁহার আপনার হইয়াছে, আর যিনি বিশ্বেশ্বর, তাঁহার চরণেও বিশ্বপ্রেমিকের ভালবাসা গিয়া পহুঁছিয়াছে। তখন তিনি জানিয়াছেন যে আমারই এই বিশ্ব, আমারই সেই বিশ্বনাথ। সন্ন্যাসী গৃহত্যাগ করিয়া গুরুপ্রণাম করিতে গেলে, গুরুদেব তাঁহাকে উঠাইয়া কাণে কাণে বলিয়া দিবেন, "হে প্রাজ্ঞ! তুমি আর কেহ নয়, তুমিই তিনি। অতএব এখন, 'আমিই তিনি, আর তিনিই আমি,' এই মন্ত্র নিয়ত জপ কর।"

গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্।
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়॥

জগতের সহিত, আর জগৎকর্ত্তার সহিত তখন তাঁহার এমনি একাত্মভাব হইয়া গিয়াছে যে, আপনার সহিত জগদাত্মার পার্থক্য তিনি আর দেখিতে পাইতেছেন না। যে গুরু চিরপ্রণম্য, চিরপূজ্যপাদ, তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে, যিনি বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেও, তখন তাঁহার আপনাকেও প্রণাম করা হয়। প্রণামকালে এইরূপ গোলে পড়িয়া তিনি তখন বলিতেছেন,—

নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তুতে॥

জগদাত্মার সহিত তাঁহার আত্মা তখন মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তিনি আর তখন পৃথক একটা মনুষ্য নাই।

তাঁহার নামরূপ তখন লোপ হইয়াছে, তাঁহার জাতিকুল ধ্বংস হইয়াছে, তাঁহার শিখাসূত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে, বিশ্বময় তখন তিনি কেবল বিশ্বরূপের রূপচ্ছটা দেখিতে পাইতেছেন। পরমাত্মার ধ্যান করিতে গিয়া তিনি দেখিতেছেন যে তাহাতে নিজাত্মারই ধ্যান করা হইতেছে,—

আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন্।
বিস্মরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি ॥

পরমানন্দে পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে, সন্ন্যাসী ক্ষিতিতলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। তাঁহার শঙ্কা নাই সঙ্গ নাই; গৃহ নাই মমতা নাই; অহঙ্কার নাই রাগ নাই।

অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥

ভালবাসার ভাব তখন তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। স্থাবর জঙ্গম তখন সকলই তাঁহার প্রেমাধীন। তাঁহার প্রেমে আর পক্ষপাত নাই, সকলেই সমান দৃষ্টি, সকলই ব্রহ্মময়। দেবতা মানুষ হইতে সামান্য কীট পর্য্যন্ত সকলই তাঁহার চক্ষে সমান।

সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ দেবে কীটে তথা নরে।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥

ইহারই নাম সন্ন্যাসী, ইহারই নাম বিশ্বপ্রেমিক, ইহারই নাম জীবন্মুক্ত যোগী। এমন প্রেমিকের পায়ে প্রণাম্ করিতে পাইলেও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতে হয়। যাঁহার অদৃষ্টে আছে, চেষ্টা করিলে, কালক্রমে এরূপ অমূল্য পদবী তিনি লাভ করিতে পারেন। এক জন্মে যাঁহার

না হইবে,—একজন্মে যে সকলেরই হইবে এমন সম্ভাবনা কি, জন্ম জন্মান্তরে চেষ্টা কর, অবশ্যই সফলকাম হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সময় নিয়ম অতিক্রম করিয়া কেহ কোন চেষ্টা করিও না। সকল কাজেরই সময় আছে, নিয়ম আছে। শাস্ত্র বলিয়া দিয়াছেন, বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, যৌবনে অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার-সুখ ভোগ করিবে, প্রৌঢ় বয়সে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে, আর শেষ-দশায় সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে।

বিদ্যামুপার্জ্জয়েৎ বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ॥

কথাটায় আবার কেহ যেন ভ্রান্ত না হন। ধর্ম্মকর্ম্ম কেবল প্রৌঢ় বয়সে করিবে, আর অন্যকালে অধর্ম্ম করিবে, এরূপ অর্থ যেন কেহ করিয়া না বসেন। ধর্ম্মাচরণ সকল কালেই করিবে; সকলই ধর্ম্মাচরণ। বিদ্যা উপার্জ্জন, সংসারভোগ, সন্তান উৎপাদন, সন্তান পালন এ সকলও ধর্ম্মকর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ। যে বয়সে যে ধর্ম্মের আচরণ করিবে, তাহারই বিধান উপরি-উক্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে। সোপানপরম্পরা যথাক্রমে অতিক্রম করিয়া মানবজীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে হয়। সেই সোপানমার্গই উক্ত শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "প্রৌঢ়ে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে," ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সে সময় ভোগ-বাসনা শিথিল হইয়া আসিয়াছে, অতএব চরম লক্ষ্য ভাবিয়া তখন পরকালের পথপানেই অধিকতর দৃষ্টিপাত করিবে। শাস্ত্রার্থ যাঁহার বুঝিবার শক্তি আছে, ভাল করিয়া সকল

কথা বুঝাই তাঁহার উচিত। আধা-শিক্ষা বড় অনিষ্টকব। আব যাঁহার বুঝিবার শক্তি নাই, তিনি কেবল মানিযা চলুন, ফল সমানই হইবে। কিন্তু যিনি বুঝিয়াও বুঝিবেন না, অথচ অহঙ্কার করিয়া মানিবেন না; উৎসন্ন যাইবাব পথ তাঁহার জন্য খোলা আছে। নরকের পথ বড় সুগম। যে পথে উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, তাহাই ত দুরারোহ।

এতক্ষণ আমি তন্ত্র-শাস্ত্র হইতেই বচন প্রমাণ উদ্ধৃত কবিযা সংসাব ও সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কথা বিবৃত করিযাছি। তন্ত্রের বক্তা মহাযোগী মহাদেব, শ্রোত্রী স্বয়ং পার্ব্বতী। তন্ত্রের একটি নাম আগম। আগমের অর্থ কি?—

"আ"গতং পঞ্চবক্ত্রাত্তু "গ"তঞ্চ গিরিজাননে।
"ম"তঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে ॥

আ, গ, ম, এই তিন অক্ষবে আগম শব্দ গঠিত। ইহাব অর্থ এইরূপ। যাহা পঞ্চাননের মুখ হইতে "আ"গত, যাহা গিরিজার মুখে "গ"ত, অর্থাৎ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট, এবং যাহা বাসুদেবেবও "ম"তসিদ্ধ, তাহারই নাম "আগম"। পঞ্চানন পঞ্চমুখে পঞ্চসত্য করিয়া গিরিরাজনন্দিনীকে বলিয়াছেন, "শুন প্রিযে! আমি বলিতেছি, আগমমার্গ বিনা কলিযুগে জীবের গত্যন্তব নাই।"

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে ॥

তন্ত্রশাস্ত্র মহাদেবের মুখবিনির্গত, এবং নারায়ণের অনুমোদিত। এখন নারাযণের নিজমুখের বাণী যদি শুনিতে চাও, তবে গীতার আশ্রয় লইতে হয়। আমাদেব

সন্ন্যাসীও তাঁহার বক্তৃতায় গীতার এক-আধটা শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব সন্ন্যাস সম্বন্ধে গীতা কি বলেন, এস্থলে আমাদের একবার দেখা উচিত। ভালবাসার ব্যাখ্যায় ভগবদ্গীতার সন্ধান না লইলেও মনস্তৃপ্তি হয় না। ভালবাসাতেই গীতার সৃষ্টি, ভালবাসাতেই ভগবানের মুখে গীতাশাস্ত্রের অমৃত-বৃষ্টি। অর্জ্জুন ভগবানের ভালবাসার পাত্র। প্রিয়সখার প্রেমাধীন হইয়া, ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার রথের সারথ্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে বীরকুলচূড়ামণি অর্জ্জুনের মনে অকালবৈরাগ্যের উদয় হইল। কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইলে, অর্জ্জুন বলিলেন,—"ঠাকুর! উভয়সেনার মাঝখানে রথখানা একবার রাখ দেখি, আমি বুঝি কাহার সঙ্গে আমায় যুঝিতে হইবে।" রথ উভয়সেনার মধ্যস্থলে স্থাপিত হইল। অর্জ্জুন দেখিলেন উভয়পক্ষেই আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি কুটুম্ব, ভাই বন্ধু, শ্বশুর শ্যালক পরস্পর বিজীগীষু হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছে। দেখিয়া বীরের হৃদয় করুণরসে গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ইহাদের রক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া সিংহাসন লাভ করিতে হইবে? ছার রাজ্যের জন্য এই স্বজন-শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিব? না ঠাকুর! আমা হইতে তা হইবে না। ত্রিভুবনের রাজত্ব পাইলেও আমি ইহাদের গায়ে হাত তুলিতে পারি না। এই নাও তোমার গাণ্ডীব। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলাম। এখন উহারা যদি নিরস্ত্র পাইয়া আমায় বধ করিয়া ফেলে তথাপি আমি কথাটি কহিব না।"

ভূভারহারী দেখিলেন ঘোর বিপদ। পাণ্ডবের যিনি ভরসা, বীরকুলের যিনি রাজা, তিনি এসময় ভ্রান্ত হইয়া স্বধর্ম্ম ও স্বকর্ত্তব্যে বীতচেষ্ট হইতেছেন। তাই প্রিয়সখাকে কর্ত্তব্য বুঝাইবার নিমিত্ত তিনি তত্ত্বকথা শুনাইতে লাগিলেন। ইহারই নাম গীতা। গীতায় সকল ধর্ম্মের, সকল শাস্ত্রের সার কথা আছে। সংসার-ধর্ম্ম সন্ন্যাস-ধর্ম্ম মোক্ষ-ধর্ম্ম, জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ কর্ম্মমার্গ, প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বের সূক্ষ্মবিধি গীতাশাস্ত্রে ভগবানের ভাষায় উক্ত হইয়াছে। গীতা পরাৎপরের মুখনিঃসৃত পরম শাস্ত্র। সেই গীতায় সন্ন্যাসের কথা কিরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে দেখা যাক্।

ভগবান বলিতেছেন—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যং সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

"হে বীরবর! যাঁহার দ্বেষ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি দ্বন্দ্বরহিত, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী। সংসার-বন্ধন হইতে তিনি সচ্ছন্দে মুক্ত হইতে পারেন।" কিন্তু সন্ন্যাসী হইলেই যে একবারে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, অথবা কেবল কর্ম্মত্যাগ করিলেই যে তাহাকে সন্ন্যাসী বলা যায়, ভগবান এমন কথা বলেন না। তাঁহার মতে—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥

ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া যিনি বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। নতুবা যিনি কেবল অক্রিয় অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী অথবা নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিতে

হোম যজ্ঞাদি যে সকল কর্ম্ম হয় তাহা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন যোগীও নহেন।

ভগবান সন্ন্যাসকেই, আবার যোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ফলসংকল্প পরিত্যাগ না করিলে যে যোগী হওয়া যায় না, পরবর্ত্তী শ্লোকে সে কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।—

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥

এতদ্বারা ভগবানের অভিপ্রায় এই বুঝা যাইতেছে যে, তুমি যোগী হও, সন্ন্যাসী হও, তথাপি তোমায় কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না। কেবল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেই তোমার যোগসাধন সম্পন্ন হইবে। স্বর্গাদি ফললাভের কামনায় যে কর্ম্ম করে সে যোগী নয়, সংসারী। কিন্তু ফললাভের কামনা ত্যাগ করিয়া যে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া, শাস্ত্রবিহিত বলিয়া, ভগবানের কর্ম্ম করিতেছি বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সংসারী হইলেও যোগী অথবা সন্ন্যাসী। ইহারই নাম কর্ম্মযোগ, ইহারই নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই নিষ্কাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাই গীতার পরতে পরতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

কর্ম্মত্যাগের কথাও গীতায় উক্ত হইয়াছে বটে। যিনি জ্ঞানমার্গানুসারী, যিনি ধ্যানধারণাবিৎ, যিনি তপোনিরত, তিনি কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন। তিনিও সন্ন্যাসী। আর যিনি নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিও সন্ন্যাসী। এই দ্বিবিধ সন্ন্যাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলে,

ভগবান নিষ্কাম-কর্ম্মী সন্ন্যাসীকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উত্তর দিয়াছেন।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥

এই শ্লোকের সহজ বাঙ্গালা অর্থ এইরূপ। "সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মঙ্গলকর বটে। কিন্তু উহার মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই বিশিষ্ট, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।"

এস্থলে টীকাকারেরা বলেন যে, যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, আত্মতত্ত্বজ্ঞানে যিনি অধিকারী হন নাই, তাঁহার পক্ষেই কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগের প্রাধান্য কথিত হইয়াছে। শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ হইলেও, কোন শাস্ত্রের সহিতই ইহার বিরোধ নাই। জ্ঞান বল, কর্ম্ম বল, সকলেরই লক্ষ্য সেই একই পথে। চিত্তশুদ্ধি বিনা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। চিত্তশুদ্ধির প্রধান সাধন কর্ম্ম। ভগবান বলিতেছেন—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকার তাৎপর্য্য বাঙ্গালাতেই বলি। "যাবৎ জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, তাবৎ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য যে জ্ঞান তাহা লাভ হয় না। নতুবা পুরুষ কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিতে পারে না।"

তবে কর্ম্মত্যাগ কে করিতে পারে? যিনি আত্মাকে চিনিয়াছেন, আত্মানন্দ উপভোগেই যিনি সন্তুষ্ট, ভোগবাসনা যাঁহার চরিতার্থ হইয়াছে, তিনিই কর্ম্মত্যাগের অধিকারী। তাঁহার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। কেন-না, পাপপুণ্যে তিনি আকাঙ্ক্ষাশূন্য, লাভালাভে তাঁহার প্রয়োজনাভাব।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

কিন্তু ঈদৃশ ব্যক্তিও নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ করিলে করিতে পারেন। বরং করাই ভাল। কেন-না, নিজের লাভালাভ না থাকিলেও পরকে দৃষ্টান্ত দেখাইলেও সমাজের উপকার আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভগবান বলিতেছেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

হে পার্থ! আমাকেই দেখ না কেন। এই ত্রিভুবনের ভিতর আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। সুতরাং আমার কর্ত্তব্যও কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। কেন-না, আমি যদি অনলস হইয়া কর্ম্ম না করি, তবে লোকে সর্ব্বথা আমার দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিবে।

কর্ম্ম মাহাত্ম্যের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, এমন উৎকৃষ্ট প্রমাণ ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যিনি কর্ম্মফল-

দাতা, যাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া জীব মোক্ষ-পথের পথিক হয়, তিনি স্বয়ং বলিতেছেন, আমার কর্ত্তব্য না থাকিলেও দেখ আমি কর্ম্ম করিতেছি।

জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গের কথা উক্ত হইল। ইহা ছাড়া আর একটা পথ আছে, তাহার নাম ভক্তি। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জ্জুনকে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। সে উপদেশের সার কথা এই—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

আমাতেই মনঃস্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে দেহান্তে নিশ্চয়ই আমার সহিত এক হইয়া আমাতেই বাস করিবে।

ভগবানে চিত্ত বুদ্ধি স্থির করা ত সকলের সাধ্য নয়। তাহার উপায় কি? তিনি বলিতেছেন, অভ্যাস কর, চেষ্টা কর।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোসি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হই?

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥

অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে, ভগবান বলিতেছেন, আমারই কর্ম্ম কর। আমার প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করিলেই, সিদ্ধিলাভ হইবে।

তবেই দেখ, জ্ঞানলাভেরও উপায় যেমন কর্ম্ম, ভক্তি-

লাভেরও উপায় সেই কর্ম্ম। কর্ম্মই সকলের মূল। গীতারও মূল কথা—অনাসক্ত চিত্তে, নিষ্কামভাবে নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর ॥

বৃথা-বৈরাগ্য-বিমুগ্ধ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাই সমগ্র গীতাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সে কর্ম্ম আবার যে সে কর্ম্ম নয়,—প্রাণিহত্যা, স্বজনহত্যারূপ ঘোরতর নৃশংস কর্ম্ম। ভগবান বুঝাইয়া দিলেন যে, কর্ত্তব্য বলিয়া সেই নৃশংস কর্ম্মই অর্জ্জুনের পক্ষে তখন স্বধর্ম্ম, তাহা না করাই বরং অধর্ম্ম।

এখন কথা হইতে পারে, অর্জ্জুনের এত সৌভাগ্য কিসের? ভগবান তাঁহার সখা, ভগবান তাঁহার সারথি। জীব জন্মজন্মান্তরে সাধন করিয়াও যাঁহাকে পায় না, তিনি অর্জ্জুনের অশ্বরশ্মি ধরিয়া প্রিয়সখাকে পরমতত্ত্ব শুনাইতেছেন। এ সৌভাগ্য অবশ্যই অর্জ্জুনের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে। সেও কর্ম্মমূলক। পূর্ব্বজন্মে সাধনার পথে যিনি যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, যে পরিমাণে যাহার যতটুকু চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তিনি সেইরূপ সংস্কার লইয়াই পরকালে জন্মগ্রহণ করিবেন। বালককাল হইতে এইজন্যই স্বভাবতঃ সকলেরই ভগবদ্ভক্তির তারতম্য দেখা যায়। ইহকালের দীক্ষা-শিক্ষা ও কর্ম্মানুষ্ঠানগুণে সেই ভক্তির আবার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অথবা অর্জ্জুন সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে। কুরুক্ষেত্রের এই রথী-সারথি বৈকুণ্ঠের নর-নারায়ণ। ভূভারহরণে, ধর্ম্ম সংস্থা-

পদে, অবনীতলে অবতাররূপে উভয়ে পরস্পরের সহায়। তাই মানবকে প্রসঙ্গতঃ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য হয় ত এই গীতামৃত ভগবানের মুখে বিনিঃসৃত হইয়াছে। অর্জ্জুনের মত এমন ভালবাসার ভাগ্য কার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে? কোন্ গুণে, কোন্ প্রেমের জালে পাণ্ডবরথী পরমেশ্বরকে বাঁধিয়াছিলেন তা জানি না; কিন্তু কত যোগী ঋষি, কত জ্ঞানী ভক্ত, কত বিশ্বপ্রেমিক যাঁহার বিশ্বরূপ খুঁজিয়া পান না, অর্জ্জুন তাই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। গীতাতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে অর্জ্জুন বিমুগ্ধ হইয়া, অর্জ্জুন তন্ময় হইয়া, প্রিয়সখার কাছে আব্দার করিয়া বলিলেন "প্রভো! তুমি যে বলিতেছ জগৎ আর কিছুই নয়, জগৎ আমারই রূপের বিকাশমাত্র, তবে তোমার সেই বিশ্বরূপ আমি একবার দেখিতে পাই না কি?" অর্জ্জুনকে ভগবানের অদেয় কিছুই ছিল না। অর্জ্জুনে তাঁহার অনন্ত প্রীতি। অনন্তপ্রেমের ভরে অনন্তদেব বলিলেন, "অর্জ্জুন! তবে দেখ। যাহা কেহ কখন দেখে নাই, তোমায় তাহা দেখাই একবার দেখ। চর্ম্মচক্ষে তুমি দেখিতে পাইবে না, তোমায় দিব্যচক্ষু দিলাম, একবার দেখ। দেখ, দেখ অর্জ্জুন! আমার কত রূপ, কেমন রূপ,—আশ্চর্য্য, অনন্ত, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অপরিমেয়। যাহা কিছু দেখিতে চাও, সকলই আমার এই দেহে আছে। দেখ, দেখ চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডখানা আমার এই বিরাট দেহে বিরাজমান।"

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।

এই বলিয়া কৃষ্ণসখা কৃষ্ণসারথি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া আপনার বিরাটরূপ প্রকটিত করিলেন। কত মস্তক কত চক্ষু, কত চরণ কত বাহু, তাহার সংখ্যা নাই সীমা নাই। কত বর্ণ কত মূর্ত্তি, কত আয়ুধ কত অলঙ্কার, দেখিয়া কি শেষ করা যায়? কত যক্ষ রক্ষ, কত দেব দানব, কত ঋষি তপস্বী, কত গন্ধর্ব্ব কিন্নর, কত মানবমণ্ডলী, কত ভূচর খেচর, কত অসংখ্য প্রাণী সেই দেহের ভিতর বিরাজমান। স্বর্গ নরক, আকাশ পৃথিবী, কত চন্দ্র সূর্য্য, কত গ্রহ উপগ্রহ, সকলই সেই বিরাটদেহে ঝলমল করিতেছে। অনন্ত রূপের অনন্ত বৈচিত্র্য। কোথাও সহস্র মার্ত্তণ্ডের জলন্তচ্ছটায় নয়ন ধাঁদিয়া যায়, আবার কোথাও বা দিব্য কুসুমদামে, দিব্য গন্ধানুলেপনে মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। মধুরে ভৈরবে, ললিতে কুৎসিতে, কোমলে কঠিনে, উজ্জলে মলিনে বিশ্বরূপের বিশ্বমূর্ত্তি বিচিত্রিত। রূপের আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। দেখিয়া অর্জ্জুন সভয়ে, সবিস্ময়ে, প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে ভক্তিগদগদ হৃদয়ে মস্তক নত করিয়া বলিলেন। "ঠাকুর! কে তুমি এইবার তোমায় দেখিলাম, এইবার তোমায় চিনিলাম। তুমি আদিদেব, তুমি সেই পুরাতন পুরুষ; তুমি এই বিশ্বের আধার, তুমিই পরমধাম, তুমি সব জ্ঞান, তোমাকে জানিলেই সব জানা হয়, তুমি অনন্তরূপে এই বিশ্বমণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছ।"

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

তোমায় প্রণাম করিব কোথায় ঠাকুর! চারিদিকেই যে তোমার মুখচক্ষু, চারিদিকেই যে তোমার করচরণ। তুমি সর্ব্বব্যাপী অনন্তশক্তি। অতএব সম্মুখে পশ্চাতে সর্ব্বত্র সকলদিকেই তোমাকে নমস্কার করি।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোসি ততোসি সর্ব্বঃ ॥

এই বিশ্বরূপী বিরাটমূর্ত্তি অর্জ্জুন আগে দেখেন নাই, আগে চিনেন নাই। কিন্তু না চিনিয়া না জানিয়াও অহেতুকী ভক্তির ডোরে ইহাঁকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ইহাঁকে হে সখা, হে কৃষ্ণ, হে যাদব ইত্যাদি পদে সম্বোধন করিতেন। ইহাঁর সহিত একত্র পানাহার, শয়ন উপবেশনও করিতেন। পরিহাসচ্ছলে কখনও বা তিরস্কারও করিতেন। এখন দেখিয়া শুনিয়া সে সকলের জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। বলিতেছেন প্রভো! আমি অজ্ঞান,— আমি তোমার মহিমা ত জানিতাম না। তুমি যে অপ্রমেয় তাহা ত আমি বুঝিতাম না। অতএব এখন ক্ষমা কর দেব!

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

অর্জ্জুনের এই ভালবাসার পায়ে নমস্কার। মহাভারতের এই মহানায়কের চরণে কোটি কোটি নমস্কার! তাঁহার এ ভালবাসার সহিত অন্য কাহারও তুলনাই হয় না। ভগবান নিজেই বলিয়াছেন, "দান বল ধ্যান বল, অধ্যয়ন বল অনুষ্ঠান বল, কিছুতেই আমার এ রূপ নরলোকে তুমি ছাড়া আর কেহ দেখিতে পায় না।"

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈ
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্যোঽহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥

ইহজন্মে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া, সংসারধর্ম্ম পালন না করিয়া, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সাধারণ জীবের তুলনা করিতে যাওয়া বৃথা স্পর্দ্ধা বৈ ত নয়। ভগবানের প্রতি ভালবাসা তুমি আমি কতটুকু সাধন করিতে পারিয়াছি? আমাদের এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম কতটুকু ধারণা করিতে পারি? ভালবাসিতে কি আমরা জানি, ভালবাসিতে কি আমরা পারি? ভালবাসিতেন শুক শঙ্কর, ভালবাসিতেন ধ্রুব প্রহ্লাদ, ভালবাসিতেন চৈতন্য গৌতম, ভালবাসিতেন কপিল নারদ,

ভালবাসিতেন বিদুর যুধিষ্ঠির, ভালবাসিতেন নন্দ যশোদা, ভালবাসিতেন উদ্ধব অক্রূর, ভালবাসিতেন শ্রীদাম সুদাম, ভালবাসিতেন চিত্রা চন্দ্রাবলী, আর ভালবাসিতেন,—

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমাচ পরাত্মিকা।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষস্থলস্থিতা॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নির্গুণা পরা।
বৃন্দাবনে চ বিজয়া যমুনাতটবাসিনী॥
গোপাঙ্গনানাং প্রথমা গোপিকা গোপমাতৃকা।
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দনকামিনী॥

আবার বলি, ইহাঁদের সহিত তোমার আমার তুলনা কি ভাই? অসাধারণের সহিত সাধারণের তুলনা কেন? তোমার আমার পক্ষে সেই সোজা পথ। এস ধাপে ধাপে পা দিয়া যদি ছাদে উঠিতে পারি। বৃথা লম্ফে ঝম্পে বিফল চেষ্টা করিয়া মরি কেন? শাস্ত্র আমাদের সাথী, যুক্তি আমাদের সহায়; ইহাঁদের নির্দিষ্ট সরল পথে পদার্পণ করিয়া, পথের সম্বল সঞ্চয় করিতে করিতে এস ধীরে ধীরে অগ্রসর হই। বিশ্বপ্রেমশিক্ষা একটা শূন্য শিক্ষা নয়, উহা কিছু ধুকুড়ি মন্ত্র নয়, ভেল্‌কি বাজী নয়। সংসারে আমার এখনও পূর্ণ মমতা, বাসনার দায়ে আমি এখনও বিব্রত, আমি কামনার ক্রীত কিঙ্কর, আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? সৌন্দর্য্য দেখিলে আমি এখনও মোহিত হই, কুৎসিতে আমি এখনও ঘৃণা করি; আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? আপনার ছেলেটিকে কোলে করিয়া আমি আদর করি, প্রতিবাসীকে পর বলি, আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? বাজ-

মহিষীর চরণে আমি উদ্দেশে প্রণাম করি, কাঙ্গালিনী পায়ে লুটাইলেও গর্ব্বভরে কথা কহি না, আমি কি ভাই বিশ্ব-প্রেমিক? দুরন্তের দণ্ডভয়ে মাথা হেঁট করি, দুর্ব্বলের মাথায় পদাঘাত করি, আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? যেখানে ফুলটি ফুটে যেখানে নির্ঝর ছুটে; যেখানে বিহঙ্গ গায়, যেখানে তটিনী ধায়, যেখানে বালক হাসে যেখানে যুবতী ভাসে, যেখানে মলয় বহে, যেখানে বসন্ত বহে, যেখানে বংশী বাজে, যেখানে রূপসী সাজে, যেখানে জ্যোৎস্না ফুটে, যেখানে সঙ্গীত ছুটে, কেবল সেই সেইখানেই আমার মনঃপ্রাণ পড়িয়া থাকে, আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? পুত্রশোক-শল্য এখনও আমার হৃদয়ে গিয়া বিঁধে, গৃহিণী-হারা হইলে আমি এখনও আত্মহারা হই, রাগদ্বেষে আমার হৃদয় ভরা, অমুক শত্রু অমুক মিত্র, এই ভেদজ্ঞানে আমার বুদ্ধি কলুষিত, আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? আমার পিতা আমার মাতা, আমার পুত্র আমার কন্যা, আমার ঘর আমার সংসার, আমার দেহ আমার প্রাণ, আমার জন্ম আমার মৃত্যু ইত্যাদি মায়ার কুহকে আমি এখনও প্রবঞ্চিত, আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? বিশ্বপ্রেমিক তবে কাহাকে বলে? ভগ-বানকে ভালবাসিতে কে শিখিয়াছে, ভগবানের প্রিয়পাত্র কে হইতে পারে? তিনি নিজেই তাহার পরিচয় দিয়াছেন—

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

"যাহার হর্ষ নাই, শোক নাই, দ্বেষ নাই আকাঙ্ক্ষা নাই, হিত নাই অহিত নাই; গৃহ নাই আসক্তি নাই; যে আমায় ভক্তি করে; তাহাকেই আমি ভালবাসি। শত্রু মিত্র, মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ নিন্দা ও স্তুতিবাক্যে যাহার সমভাব; যে মৌনী, যে স্থিরমতি, যে সদা সন্তুষ্ট, সেই আমার ভক্ত, তাহাকেই আমি ভালবাসি।"

যিনি বিশ্বপ্রেমিক, সর্ব্বভূত তাঁহার সমান দৃষ্টি থাকা চাই। যিনি সমদর্শী, তিনিই তত্ত্বদর্শী। তাঁহার জানা চাই যে, পরমাত্মা সর্ব্বভূতেই সমভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, আর জানা চাই যে এজগতের সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তিনি কখনও বিনষ্ট হইবেন না।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ॥

এ তত্ত্বজ্ঞান কেবল মুখে মুখে থাকিলে চলিবে না, কেবল বক্তৃতায় বলিলে চলিবে না; তাহা হইলে আমিও একজন তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতে পারিতাম। বাস্তবিক আমার যদি সে জ্ঞান হয়, বাস্তবিক আমি যদি বুঝি যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে পরমেশ্বর সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, বাস্তবিক যদি বুঝি যে এজগতে কেবলমাত্র তিনিই আছেন আর কিছুই নাই; তাহা হইলে আর আত্মপর ভেদ থাকিবে কেন, ভালমন্দ বোধ থাকিবে কেন, জরামরণের ভয় থাকিবে

কেন? তখন বুঝিব যে সবই ত তিনি। আমিও তিনি, ভ্রমে পড়িয়া যাহাদিগকে এক একটা সম্পর্ক বোধে সম্বোধন করি, তাহারাও তিনি; এই বৃক্ষশিলা-চেতন-অচেতন-সলিল-অনিল-অনল-আকাশময় বিরাট ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে এক-মাত্র তিনি ভিন্ন অন্য বস্তু আর নাই। তিনি "একমেবা-দ্বিতীয়ং।" তাঁহা ছাড়া "তুমি" বলিয়া আর কোন পদার্থ নাই, কেন না তুমিও তিনি—"তত্ত্বমসি।" "আমি" বলিয়াও একটা পৃথক্ সামগ্রী নাই। আমিও তিনি—"সোঽহং।" ইহারই নাম বিশ্বপ্রেম, ইহারই নাম তত্ত্বজ্ঞান, ইহারই নাম বেদান্তের অদ্বৈতবাদ।

এই বিশ্বপ্রেমের আবেগভরেই, ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদ বলিয়া-ছিলেন, "হাঁ পিতঃ! ঐ স্তম্ভমধ্যেও আমার বিশ্বপতি অব-স্থিতি করিতেছেন।" এই তত্ত্বজ্ঞানে মত্ত হইয়াই শুকদেব জন্মযোগী। এই অদ্বৈতবাদের মহিমা লইয়াই শঙ্কর সন্ন্যাসী। প্রকৃত সন্ন্যাসে অধিকার যাঁহার হইয়াছে, সন্ন্যাসী-কুল-শেখর শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্যই বলিতে পারেন—

> ন মৃত্যুর্ণ শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ
> পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্মঃ।
> ন বন্ধুর্ণ মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য
> শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
> অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
> বিভুর্ব্যাপি সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
> ন বন্ধন নৈব মুক্তির্ণ ভীতি
> শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

এখন একবার ধীরে ধীরে, সবিনয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে, আমাদের সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করি ভাই! শঙ্করের সন্ন্যাস-বাদে তোমার অধিকার হইয়াছে কি? আমাদের সন্ন্যাসী সুবোধ শান্ত, পণ্ডিত প্রেমিক, ধীর ধার্ম্মিক এ সকলই আমি স্বীকার করি; কেবল স্বীকার করি না যে তিনি সন্ন্যাসী। যে যে গুণ থাকিলে মানুষ সংসারে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে, সে সমস্ত গুণেই ইনি অলঙ্কৃত; তথাপি আমাদের সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নহেন। সাংসারিক প্রেমের ভগ্নাংশ লইয়া যিনি সংসার ত্যাগ করেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন। সাংসারিক ভালবাসার পিপাসা ইঁহার এখনও মিটে নাই, সে ভালবাসার বাসা এখনও ভাঙ্গে নাই, হৃদয়ের অতি নিভৃত কক্ষে প্রিয়জনবিরহের দুরন্ত-শিখা এখনও ধীকি ধীকি জ্বলিতেছে। নহিলে ইঁহার—

এখনও এখনও প্রাণ সে নামে শিহরে কেন?
এখনও স্মরিলে তারে কেন রে উথলে মন?

এখনও সেই কথা স্মরণ করিলে, সে কথার পরিচয় দিতে গেলে, এখনও সে বিষয়ের প্রসঙ্গ হইলে, এখনও ভালবাসার গান শুনিলে ইঁহার হৃদয়সাগরে বাসনার তরঙ্গ খেলিতে থাকে, কূলপ্লাবী সলিলধারা নয়ন ভেদিয়া বাহিরে বহিয়া যায়। ঐটুকুই ত রোগ, ঐটুকুর ক্ষয় না হইলে ত নিস্তার নাই। ইঁহার রোগের পরিচয় গিরিশ ভায়ার গানেই ত ধরা পড়িয়াছে—

অনুভবে বুঝা গেছে, মান হেন সাজায়েছে,
সকলি গিয়াছে কেবল আছে বাঁকা নয়ন বিশেষ।

আমাদের সন্ন্যাসীর আর কোন রোগও যদি না থাকে, তথাপি ঐ বাঁকা নয়নটুকুতেই যে সব আট্‌কাইয়া আছে। ঐ আক্ষেপের অংশ, ঐ বাসনার বিন্দু যতদিন না নির্ম্মূল হইবে, ততদিন সন্ন্যাসধর্ম্মে ইঁহার কোন অধিকার নাই, সন্ন্যাসব্রতে ইনি কদাচই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। সংসারে থাকিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে চিত্তের এই মলিনতা যে ঘুচিবার নহে, একথা এখন বলা কেবল পুনরুক্তিমাত্র। অতএব আমার বিনীত নিবেদন এই যে সন্ন্যাসী অনধিকার-চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া গৃহ প্রতিগমন করুন, পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিয়া যথানিয়মে সংসারধর্ম্ম পালন করুন, তত্ত্ব-জ্ঞানমার্গের যেস্থান হইতে স্থানচ্যুত হইয়া বিপথে পদার্পণ করিয়াছেন, তথা হইতে আবার আরম্ভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ সোপানপরম্পরা লঙ্ঘন পূর্ব্বক পরমার্থের পথে অগ্রসর হইতে থাকুন। সংসারে গৃহস্থের কর্ত্তব্য অনেক আছে। দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ হইতে মুক্ত না হইলে তাঁহার পরি-ত্রাণ নাই। বংশলোপ না হয়, পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ না হয়, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে ত্রুটি না হয়, এ সকল তাঁহাকে অগ্রে দেখিতে হইবে। রমণীর ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। পতিসেবাই রমণীর পরম ধর্ম্ম। পতিই তাঁহার দেবতা। পতি বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিলে সাধ্বী তাঁহার অনুগমন করেন, পতি প্রাণত্যাগ করিলে তিনি তাঁহার সহগমন করেন, অথবা ব্রহ্মচারিণী হইয়া, সংসার-সন্ন্যাসিনীবেশে সংসারে থাকিয়া, নিষ্কামে কর্ম্মানুষ্ঠান করত ইহজীবনে পতিপদ ধ্যান করিতে করিতে মোক্ষধামে উপনীত হইতে পারেন।

রমণীর হৃদয়ও ভাবপ্রধান, উহা ভালবাসার আধারভূমি। তাই রমণীর পতিপ্রেম অনায়াসেই বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইতে পারে। সংসাররক্ষা, সংসার পালনের ভার পুরুষের হাতে। পুরুষ নিষ্কামভাবে সেই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। স্বর্গসুখ বা পরকালের ভোগবিলাসবাসনা পরিত্যাগ করুন; কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করুন; কর্ত্তব্যাচরণ করিয়া বলুন, "ইদং কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতং।" "ঠাকুর! আমি তোমারই কাজ করিলাম, কিন্তু আমি ইহার মূল্য চাহি না। ইহার ফল যা থাকে, তোমাতেই তাহা সমর্পণ করিলাম।" এইরূপে নিষ্কামচিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া আসিবে, বাসনার বিলয় হইবে, তত্ত্বজ্ঞান স্ফূরিত হইবে। তারপর প্রকৃত বৈরাগ্যসঞ্চার হইলে অনায়াসে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিও, সাধনায় সিদ্ধ হইবে। আর তোমায় কাঁদিতে হইবে না, আর তোমায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে হইবে না। মায়ার আবরণ একবার উন্মুক্ত হইলে লক্ষ প্রলোভনেও আর তোমায় মোহিত করিতে পারিবে না। উপসংহারে শেষকথা সন্ন্যাসীকে বলি ভাই! সাংসারিক ভালবাসা যদি বিশ্বপ্রেমে পরিণত করিতে চাও, সাংসারিক ভালবাসা যদি ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিতে চাও, তবে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পথ ভুলিও না। পথ ভুলিলেই পথ বাড়িবে। এখন দিগ্‌ভ্রম যদি ঘুচিয়া থাকে, তবে ফিরিয়া সেই সোজাপথে আবার যাও। জ্ঞানচক্ষু ফুটিলে বৈকুণ্ঠের পথ, অনন্ত ভালবাসার, অনন্ত প্রেমময়ের পথ আপনা আপনি দেখিতে পাইবে। তোমার অবস্থা

হীন নয়, পথের সম্বল তোমার দ্বারা সহজেই সঞ্চিত হইবে, চরমস্থানে অনায়াসে উপনীত হইতে পারিবে।

আমার বক্তৃতার পর করতালি থামিলে, তিনজন সভ্য উঠিয়া একে একে তিনটি প্রস্তাব করিলেন। বন্ধু ব্রজরাজ বলিলেন, "ভালবাসার সমস্ত বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ভার সভাপতি গ্রহণ করুন। রসিকরঞ্জন প্রস্তাব করিলেন, "এই ভালবাসার সভা হইতে সভাপতিকে "প্রেমিকরতন" উপাধি দেওয়া হউক।" আর স্বয়ং সন্ন্যাসী সভাপতির সহজপ্রাপ্য ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলে, সকলগুলিই সর্ব্বজনসম্মতিক্রমে গৃহীত ও সমর্থিত হওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

সভাভঙ্গের পর, সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে, সন্ধ্যার সময়, আমরা কয়েক বন্ধুতে নিভৃত কক্ষে বসিয়া সন্ন্যাসীকে চাপিয়া ধরিলাম যে নাম ধামের পরিচয় না দিলে কিছুতেই ছাড়িব না। অনেক তর্কের পর, নিজ পরিচয়বৃত্তান্ত তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলেন। তাঁহার নাম শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ীর ঠিকানা আমি এ গ্রন্থে উল্লেখ করিব না। তাঁহারা দুই সহোদর; তিনিই জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের নাম কুলশেখর। পিতামাতা উভয়েই অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপ-যোগী পৈত্রিক সম্পত্তি ইহাঁদের যথেষ্ট আছে। ক্ষুদ্র জমীদারীর আয় বার্ষিক পাঁচহাজার টাকার কম নহে। জ্ঞাতি বন্ধুর যত্নে ইহাঁরা প্রতিপালিত। দুই সহোদরেই সুশিক্ষিত। শশীশেখর সংস্কৃত কলেজের এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; তিনি যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন কনিষ্ঠ বি, এ, পাশ করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কুলশেখর তখন বিবাহিত। শশীশেখরের বয়ঃক্রম এখন একত্রিশ বৎসর। পঁচিশবৎসর বয়সে ইহাঁর বিবাহ হয়। কুলশেখর ইহাঁর অপেক্ষা দুই বৎসরের কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের দুইবৎসর

পরেই কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়াছিল। শশীশেখরের পত্নীর নাম কালিন্দী। কালিন্দীর পিতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সঙ্গতিপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক; বিবাহকালে কালিন্দীর বয়স দশবৎসর ছিল। ত্রয়োদশে তিনি শশীশেখরকে সন্ন্যাসী করিয়া সংসারলীলা সম্বরণ কবিযাছেন। তাঁহার সন্তা-নাদি হয় নাই।

এইবার রসিকরঞ্জন ভায়া সন্ন্যাসীকে আরও চাপিযা ধবিলেন। "মহাশয়! ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা আপনাকে ভালবাসিতেন কি না আপনি কিরূপে জানিলেন? তিনি কি মুখরা ছিলেন? অজ্ঞান অবলার মুখের জ্বালায় কি আপনি তাঁহাকে প্রণয়বিমুখা বলিয়া স্থির কবিয়া-ছিলেন? মুখরার প্রতি বিমুখ হইলে আমাকে ত দেশত্যাগ কবিতে হয়। আমি এবিষয়ে ভুক্তভোগী। আমার ব্রাহ্ম-ণীর পবিচয় সভাস্থলেই দিয়াছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিপবীত। তিনি মুখরা হইলেও আমি তাঁহাকে প্রণয-পণ্ডিতা বলিযা জানি।"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "না মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন, সে অভাগীর প্রকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত ছিল। মুখরা দূরে থাকুক, তাহার মুখের কথা আমি কোন-কালেই স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পাই নাই। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে সে আমার সহিত কোন কথাই কহিত না, আমি বার বা'র জিজ্ঞাসা করিলে তবে নিতান্ত সংক্ষেপে অতি মৃদু স্বরে কোন কথাব উত্তর দিত। কতক কথা ঘাড় নাড়ি-যাই সারিয়া দিত। আমার দিকে মুখ তুলিয়া সে কখন

কথা কহে নাই। আমার সহিত পতিপত্নী সম্বন্ধ আছে, আমি যে তাহার পরমাত্মীয়, এ কথা হয় ত তাহার মনেও উদয় হইত না। কিন্তু এই বয়সে কত রমণীকে পুত্রবতী হইয়া গৃহিণী হইতেও ত দেখা গিয়াছে।”

এইবার আমিও থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, “ছি ছি শশীবাবু! আপনার এ বড় বিষম ভ্রম দেখিতেছি। অল্পবয়সে সকলের জ্ঞানোদয় হয় না। সকলের প্রকৃতি সমান নয়। যাহারা শান্ত, যাহারা সরল, লজ্জা যাহাদের প্রবল, বালিকাবয়সে কি তাহারা প্রণয়প্রকাশ করিতে জানে, না করিতে পারে? সে বালিকা, আপনি বয়স্থ। সে অবলা, আপনি পুরুষ। পিতামাতার অবর্ত্তমানে আপনার বিবাহ বেশী বয়সে হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বেই আপনার প্রণয়-লালসা জন্মিয়াছে; সে লালসা কি সে মিটাইতে পারে? সামান্য গানেই আছে—

না হলে রসিকা বয়োধিকা প্রেম কভু জানে না।

আর পুত্র প্রসব করিলেই কি প্রণয়যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়? আপনি পণ্ডিত হইলেও রমণীহৃদয় পরীক্ষায় পটু নহেন। দেখিতেছি, আপনার ভুল কেবল সন্ন্যাসেই নহে,—সংসারেও আপনার বিষম ভুল ছিল।”

সন্ন্যাসী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “জগদীশ্বর জানেন! ভুল হয় ত আমার সমস্ত জীবনটা। কিন্তু সে ভুলে ত আমার ক্ষতি ছিল না। কালে হয় ত সে ভুল সংশোধন হইত। কিন্তু সংশোধনের সময় ত আর ভগবান দিলেন না।”

ব্রজরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার পত্নীর মৃত্যুদৃশ্য আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কি? অন্তকালে তাঁহার কিরূপ অবস্থা দেখিলেন? লজ্জার আবরণ তখন অনেকটা মুক্ত হইয়া যায়। সে সময় আপনার দিকে চাহিয়া এক বিন্দু অশ্রুজলও কি তিনি ত্যাগ করেন নাই?"

সন্ন্যাসী শশীশেখরের চক্ষে এইবার জলধারা ছুটিল। সজল নেত্রে তিনি বলিলেন, "না, সে দৃশ্য আমায় দেখিতে হয় নাই। সে তখন পিত্রালয়ে ছিল। হঠাৎ, একদিন সন্ধ্যার সময় ডাকযোগে আমার শ্বশুরের পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'কালিন্দী পীড়িতা, তোমার একবার আসা আবশ্যক।' তখন গাড়ীর সময় নাই। অতিকষ্টে অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিলাম। পীড়ার সংবাদ কিছুই খুলিয়া লেখেন নাই। মনে মনে কত তোলাপাড়া হইতে লাগিল। কত যুগের পর, রাত্রি প্রভাত হইলে রেলের ষ্টেসনে গিয়া টিকিট লইয়া আসিবার সময় শুনিলাম পাশের ঘরে, তারের বাবু, তারের যন্ত্র নাড়িতে নাড়িতে, মুখে মুখে উচ্চারণ করিয়া সংবাদ লিখিতেছেন—Kalindi died of cholera last night.—'কালিন্দী কালরাত্রে ওলাউঠায় মরিয়াছে।' আমার বুঝিতে আর বাকী রহিল না। মাথা ঘুরিয়া পড়িল। হাতের টিকিট ভূতলে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিলাম। আর রেলে চাপিলাম না, আর গৃহে গেলাম না। অজ্ঞান অভিভূত উন্মত্ত হইয়া তদবধি দেশে বিদেশে ঘুরিতে লাগিলাম। কতদিনের পর তা মনে নাই, কোনস্থান হইতে কনিষ্ঠকে এক পত্র লিখিয়া দিয়া তথা হইতে সরিয়া পড়ি-

লাম। লিখিলাম, 'ভাই! আমার আশা ছাড়িয়া দাও। কালিন্দী আমার মাথায় বজ্রাঘাত করিয়া পলাইয়াছে। ষ্টেসনেই আমি খবর পাইয়াছি। গৃহধর্ম্ম আমা হইতে আর হইবে না। তুমি কুলশেখর। ভগবান করুন, কুল-রক্ষা, সংসাররক্ষা তোমার দ্বারাই সম্পন্ন হউক। আমার সন্ধানে বৃথা সময় নষ্ট করিও না। আমার সন্ধান আর পাইবে না।' ইহার পর, এই তিন বৎসরে আর কোন চিঠি কখনও লিখি নাই। কোন সংবাদ কখনও পাই নাই।"

কথোপকথন এই পর্য্যন্ত হইয়াছে, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল দুইটি অপরিচিত ভদ্রলোক আমার সহিত দেখা করিতে চাহিতেছেন। আমি শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বারদেশ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলাম। গৃহপ্রবেশ মাত্র তাঁহারা দুইজনে সন্ন্যাসীর দুই হাত ধরিয়া প্রিয়সম্ভাষণ করিলেন। সন্ন্যাসী সাশ্রুলোচনে কথা কহিতে লাগিলেন। কথা ত ফুরায় না। তিন বৎসরের বিরহ-নিরুদ্দেশবার্ত্তা কি একদণ্ডে ফুরায়? কথাবার্ত্তা হইতে হইতে আমরা জানিলাম, একজন শশীবাবুর কনিষ্ঠ কুলশেখর; আর এক-জন তাঁহার শালীপতি ভাই, নাম আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পত্নীর নাম জাহ্নবী। জাহ্নবী কালিন্দীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত কথোপকথন চলিল। এই তিন বৎসর ধরিয়া সন্ন্যাসীর স্বজনবর্গ তাঁহার সন্ধানে কত দেশ বিদেশে ঘুরিয়াছেন। মধুসূদন বাবু ও তাঁহার পুত্র ধরণীধর, আশুতোষ ও কুলশেখর পর্য্যায়ক্রমে, এক একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসেন। বাটী আসিয়া আবার দিনকতক

পরে বহির্গত হন। কতবার ধরি-ধরি করিয়া ইঁহারা সন্ন্যাসীকে ধরিতে পারেন নাই। তিনি ত কোথাও স্থায়ী হইতেন না। এবার সন্ধান পাইয়া, বক্তৃতার বিবরণ শুনিয়া, চেহারার পরিচয়ে নিশ্চিত হইয়া আসিয়া ধরিয়াছেন। ধরিলে কি আর ছাড়াছাড়ি আছে? আশুবাবু বলিলেন, "আমার শ্বশুরের কনিষ্ঠা কন্যা সরস্বতী এখনও অবিবাহিতা, কিন্তু বিবাহযোগ্যা। তিনি বলেন, তাঁহার কন্যা থাকিতে, আপনার মত পাত্রকে কেন সংসারত্যাগ করিতে দিবেন?" সন্ন্যাসী অনেক পীড়াপীড়িতে গৃহে যাইতে স্বীকৃত, কিন্তু বিবাহে স্বীকৃত নহেন।

অনেক তর্কের পর, অবশেষে স্থির হইল, পরদিন প্রাতে শ্বশুরালয় হইয়া সন্ন্যাসী গৃহপ্রতিগমন করিবেন। আমাদিগকেও সঙ্গে যাইতে হইবে। পরদিন ব্রজরাজ আমি, রসিক ও গিরিশ, এবং উঁহারা তিনজন এই সাতজনে যথাকালে যাত্রা করা গেল। কতক রেলে, কতক নৌকায়, কতক গাড়ীতে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিল। পথে যাইতে যাইতে কুলশেখর ও আশুবাবু পূর্ব্বদিনের লিপিবদ্ধ বক্তৃতাগুলি পড়িয়া নিঃশেষ করিলেন। অপরাহ্নে, গ্রামের অনতিদূরে একটা চটীতে বসিয়া সকলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা গেল। কেবল আশু বাবু তথায় অপেক্ষা না করিয়া অগ্রগামী হইলেন। বলিলেন, "এতগুলি ভদ্রলোক যাইতেছেন, আমি একটু অগ্রে গিয়া শ্বশুর মহাশয়কে সংবাদ দিলে ভাল হয় না?" আমরা সকলে সম্মত হইয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিলাম।

দুই তিন ছিলিম্ তামাক পোড়াইয়া গিরিশভায়া সুর ভাঁজিয়া গান ধরিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখা গেল সাত আট জন ভদ্রলোক আমাদের নিকট সাগ্রহে আসিয়া সমুপস্থিত। শশী বাবু আমার কাণেকাণে বলিলেন, ইহার মধ্যে আমার শ্বশুর মধুসূদন বাবু ও শ্যালক ধরণীধর আছেন। পিতা-পুত্রে শশব্যস্তে স্বজনসঙ্গে সকলকে লইতে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসীর সহিত সেই স্বজনমণ্ডলীর সমাগম ও মিলনবার্ত্তা লিখিয়া আর গ্রন্থবিস্তারে প্রয়োজন নাই।

মধুসূদন বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখি, সম্মুখে পূজার দালানে সভা প্রস্তুত। বৃদ্ধ পুরোহিত ও দুই একজন জ্ঞাতিকুটুম্ব সভাস্থলে বসিয়া আছেন। আমাদিগকে দেখিবামাত্র আশুতোষ বাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়! শশী বাবু বিবাহে সম্মত নহেন। আমিও বিবাহে জেদ্ করিব না। কিন্তু আমার অনুরোধ, কনে আজ দেখিয়া রাখুন। বিবাহ কোন্ আজই হইবে? আশ্বিন কার্ত্তিক দুইমাসের পরও যদি শশী বাবু মনঃস্থির করিতে না পারেন, তখন বিবাহ রহিত করা যাইবে। আজ কনে দেখিতে ক্ষতি কি?" আমরা সকলে সম্মত হইলাম, কিন্তু সন্ন্যাসী সকাতরে বলিলেন, "আমার এ দুর্দ্দিনে আমার উপর এ অত্যাচার কেন?"

আশুতোষ বাবু সে কথায় কাণ দিলেন না। তিনি সবেগে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মধুসূদন বাবু কোথায় গেলেন আর দেখিতে পাইলাম না। আমরা সভাস্থলে উপবিষ্ট হইয়া তামাকুসেবনে মগ্ন হইলাম।

সন্ন্যাসী মাথায় হাত দিয়া হেটমুণ্ডে বসিয়া রহিলেন; তাঁহার দৃষ্টি ভূমিতলে, প্রায় নিমীলিত। কিয়ৎক্ষণ পরে সবিস্ময়ে দেখিলাম—অপূর্ব্ব দৃশ্য! একদিকে আশু বাবু, আর একদিকে নবমবর্ষীয়া এক বালিকা, অনুপমলাবণ্যা-ভরণা পূর্ণযৌবনা ষোড়শী সুন্দরীর হস্তধারণ করিয়া সভা-স্থলে সমানীত করিলেন। সেই গোধূলিরাগরঞ্জিত প্রদোষ-কালে যেন সিন্দূরনিন্দিতা স্বর্ণকাদম্বিনী নিজকান্তি বিকাশ করিয়া পশ্চিম গগনপ্রান্তে সমুদিত হইলেন। সুন্দরী সভয়ে, সলজ্জে, সহর্ষে, সকাতরে, ঈষৎ কম্পান্বিত চরণে চলিয়াছেন; যেন সান্ধ্যসমীরণভরে প্রফুল্ল পদ্মিনী মৃণালশিরে সরোবরবক্ষে মৃদুমন্দ বিধূত হইতেছে। রমণী অবগুণ্ঠনবতী। তথাপি লাবণ্যলহরী বসনবেলা অতিক্রম করিয়া উথলিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এত যে লাবণ্য, ইহার উপর মালিন্যের এ ছায়া কেন? পশ্চিমাচলগামী পূর্ণিমার সুধাংশুর ন্যায় সেই শোভা আছে, মুখের আভা যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্নমরীচিদগ্ধ কুমুদিনীর ন্যায় বর্ণের সেই মাধুরী আছে, বিকাশের গৌরব যেন নাই। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বাড়িল। নিকটবর্ত্তিনী হইলে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সীমন্তিনীর হাতে লোহা, সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু। সিন্দূরশোভা শিরোবসন আভাময় করিয়াছে। আমরা অবাক্ হইয়া পরস্পরে টেপাটিপি তাকাতাকি করিতে লাগিলাম। এই কি কুমারী, এই কি শশীশেখরের ভাবীপত্নী? এ দেশে এরূপ বিবাহ চলিত আছে নাকি?

কিন্তু কৌতূহলের আর অবসর পাওয়া গেল না। আশু

বাবু সেই অপূর্ব্ব রূপসীকে বসাইয়া, সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শশীবাবু! এইবার একবার মুখ তুলিয়া চাও,—এই নাও তোমার কালিন্দী।" শুনিবামাত্র সন্ন্যাসী বজ্রাহতের ন্যায় সচকিতে চাহিয়া, মূর্চ্ছিতপ্রায় হইতেছিলেন। আশু বাবু শশব্যস্তে সাদরে তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই স্থির হও, আমার কথা শুন। তোমার কালিন্দী মরে নাই। তারের খবরে যে কালিন্দীর মৃত্যু-সম্বাদ শুনিয়াছিলে, সে কালিন্দী নয়,—কালু নন্দী। তোমাদের গ্রামস্থ জমীদার জনরঞ্জন ঘোষের সদর নায়েব মফঃস্বলে গোমস্তার নিকাশ লইতে গিয়াছিলেন। নিকাশ শেষ না হইতে হইতে গোমস্তা ওলাউঠায় মরিল। তাহার নাম কালু নন্দী। কালু নন্দী তহবিল ভাঙ্গিয়াছিল, এখন নিকাশ না দিয়া মরিল; তাহার কাগজ-পত্র ও ঘর-সম্পত্তি আটক করা যাইবে কি-না, সেই হুকুম জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়ে, নায়েব মহাশয় জরুরী বোধে তাহার মৃত্যুসংবাদটা তারযোগে পাঠাইয়াছিলেন। তার-বাবুদের অগাধ বিদ্যা। যিনি সংবাদ পাঠাইলেন, তাঁহার বিদ্যাবলে; কিম্বা যিনি সংবাদ গ্রহণ করিলেন, তাঁহার গুণপনায়; অথবা হয় ত দুই-জনের বিদ্যার সাহায্যেই "কালুনন্দী" বিভ্যদ্বর্ত্মে "কালিন্দী" হইয়া পড়িলেন। সেই "কালিন্দী" কাণে বাজিবামাত্রই শশীবাবুও সংসার ছাড়িলেন। কাহার সংবাদ, কে পাঠাইল, শেষ-কথাই বা কি ছিল, জানিবার জন্য অপেক্ষা করিলেন না।' কুলশেখর বাবু তাঁহার পত্র পাইলে, আমরা অনুসন্ধানে সব জানিলাম, সব বুঝিলাম। কালিন্দীর ওলাউঠা হয়

নাই, সামান্য জ্বর হইয়াছিল মাত্র। অল্পদিনেই সারিয়া গেল। ওলাউঠায় মরিলে তাহার পক্ষে ভাল ছিল বটে। সে মরণ একদিনে, না হয় দুইতিন দিনে হইত; তিন বৎসর ধরিয়া এমন করিয়া পুড়িয়া পুড়িয়া মরিতে হইত না। কালিন্দী যে বাঁচিয়া আছেন, এ সংবাদ আমি কল্য অবধি শশীবাবুকে দিই নাই। তাহার কারণ এই যে উনি তাহা শুনিলে, হয় ত তখনি তাহাকে দেখিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িতেন। অধৈর্য্যের আতিশয্যে মূর্চ্ছা হইতে পারে। কালিন্দীকে আমি ত কাঁধে করিয়া লইয়া যাই নাই! আপনারা বলুন দেখি কোন্ ঔষধে সে অধৈর্য্যব্যাধি নিবারণ করিতাম? যিনি বালিকা-কালিন্দীর বয়োবৃদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে প্রণয়-পরাঙ্মুখী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যিনি তারের সংবাদের আগাগোড়া না শুনিয়া কালিন্দীর মৃত্যুবার্ত্তা নিশ্চিত করিয়া লইয়াছিলেন, তিনি কি কালিন্দীকে না দেখিয়া কালিন্দীর জীবিতসংবাদে স্থির থাকিতে পারিতেন? এই জন্যই আমি কুলশেখরের সহিত এ বিষয়ে অগ্রে পরামর্শ করিয়াছিলাম, আর এই সকল আয়োজন করিবার জন্যই আপনাদিগকে ফেলিয়া অগ্রগামী হইয়াছিলাম। এখন কনে দেখা হইল, বিবাহ কি শশী বাবু রহিত করিতে বলেন?”

শশী বাবু আর মাথামুণ্ড বলিবেন কি? তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। দরবিগলিত ধারায়, গণ্ডস্থল ভাসাইয়া আনন্দাশ্রুপ্রবাহ ছুটিল। রোদন ভিন্ন এ সকল কথার উত্তর আর কি হইতে পারে!

আশুবাবু এইবার কালিন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কালিন্দি! সন্ন্যাসীর পায়ে, তোমার স্বামীর পায়ে এই-বার প্রণাম কর।" প্রণাম করিতে গিয়া, প্রেমময়ীর নয়-নাশ্রু আর লজ্জার বন্ধন মানিল না। বিরলে তিনি কত কাঁদিয়াছেন তা কে জানে? কিন্তু প্রকাশ্যে, লজ্জার খাতিরে, শ্বাসবারি সকলই ত চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে। আজ স্বামীসমীপে, সোহাগে, অভিমানে, হর্ষে, বিষাদে, সভার মাঝখানে তিন বৎসরের সেই রুদ্ধ প্রবাহ বালির বাঁধ ভাসাইয়া দিয়া সবেগে ছুটিল। সে অশ্রু কি সুন্দর! ত্রিভুবনের হাসিরাশি একত্র করিলেও বুঝি সে সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনা হয় না। প্রেমিকের পায়ে প্রেমময়ীর প্রণয়-বারি! যেন মন্দাকিনীর পূতধারা উচ্ছসিত সাগরবক্ষে সিঞ্চিত হইতেছে। যেন নিদাঘকাদম্বিনীর স্নিগ্ধবারি চিরোত্তপ্ত মরুক্ষেত্রে নিপতিত হইতেছে। যেন শীতাংশুর পীযূষরশ্মি চকোরের তৃষিতকণ্ঠে বর্ষিত হইতেছে। আর সন্ন্যাসী শশীশেখরের পক্ষে যেন—

পিপাসাক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বু পক্ষিণা।
নবমেঘোজ্‌ঝিতা চাস্য ধারা নিপতিতা মুখে॥

ব্রীড়াবিড়ম্বিতা কালিন্দী, কোমল করপল্লবে দুই চক্ষের জলধারা মুছিয়া, গুরুজনের অনুরোধে, চিরসন্তাপিত, চিরবিরহিত স্বামীর চরণে প্রণত হইয়া, পার্শ্বোপবিষ্ট পুরো-হিতের চরণেও প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন, এইবার কথা কহিলেন। সম্পর্কে তিনি কালিন্দীর পিতামহস্থানীয়। তিনি বলিলেন, "কালিন্দি!

তোমার জলে কল্লোল নাই কেন? তোমার কল্লোল-কোলাহলে ক্রীড়া করিতে শশীশেখর বড় কুতূহলী। আমি আশীর্ব্বাদ করি, এইবার তুমি কল্লোলময়ী হও, আর তোমার শ্রীকৃষ্ণ তোমার জলকল্লোলে কেলি করিতে করিতে বিরহ-কংস ধ্বংস করিয়া তোমার কল্যাণ বিধান করুন।”

কালিন্দী-জলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী।
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জর-কেশরী॥

সংসারলক্ষ্মী সংসারসন্ন্যাসীর পায়ে প্রণাম করিয়া, পুরো-হিতের আশীর্ব্বাদ লইয়া, ধীরে ধীরে ললিতপদবিক্ষেপে অন্তঃপুরমধ্যে চলিয়া গেলেন। আমাদের বন্ধু ব্রজরাজ চিরতার্কিক। পুরোহিতকে হাতে পাইয়া তিনি প্রশ্ন করি-লেন, “মহাশয়! এমন চম্পকবরণীর নাম কালিন্দী কে রাখিল?” পুরোহিত উত্তর করিলেন, “মহাশয়! মার্জ্জনা করিবেন, এ নামটি আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। মধুসূদ-নের মধ্যমা কন্যা, শৈশবে একদিন দোয়াতের কালি ঢালিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নৃত্যকালী সাজিয়া নীলবসনা বিকাশে নাচিতেছিল, দেখিয়া আমি আদর করিয়া ডাকিলাম, ‘কালিঝুলি মাখিয়া এ কি রঙ্গ হইতেছে কালিন্দি।’ তৎ-পূর্ব্বে ইহার নাম কিছুই স্থির হয় নাই। সেইদিন হইতে সকলেই উহাকে আদর করিয়া কালিন্দী বলিয়াই ডাকিতে লাগিল। অতঃপর সেই কালিন্দী নামই চলিয়া গেল। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে ঘুচাইবে বল? কালিন্দী না হইলে কালুনন্দীর মরণে উহাকে মরিতে হইবে কেন?”

সন্ন্যাসী শশীশেখরকে এইবার অন্তঃপুরে ডাক পড়িল। সেখানে সীমন্তিনীগণের হস্তে তাঁহার কি দুর্দ্দশা হইল তা জানি না, কিন্তু শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির কোলাহলটা আমরা বহির্দ্দেশ হইতে শুনিতে পাইলাম। শুনিতে শুনিতে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমরা সন্ধ্যাকৃত্য সম্পাদন করিতে উঠিলাম।

সন্ধ্যার পর, মজ্‌লিশ্‌ করিয়া ধরণীবাবুর বৈটকখানায় আমরা আড্‌ডা লইলাম। তথায় ঢোলক-তব্‌লা, সেতার তানপুরা প্রভৃতি সঙ্গীতের সরঞ্জাম সমস্তই আছে। আশু বাবু তব্‌লা পাড়িয়া বলিলেন, "আপনাদের ভিতর যদি কেহ গাহিতে পারেন, তবে আসুন না, একটু আমোদ করা যাক্।" বলিতে বলিতে শশী বাবু আসিয়া উপস্থিত। শশী বাবুর তখন আর সন্ন্যাসীবেশ নাই। প্রাতঃকালে আমাদের বাটী হইতে যাত্রা করিবার সময়েই আমি সে বেশ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসীর সজ্জা শ্বশুরালয়ে দেখাইবার অভিপ্রায়েই বুঝি আশু বাবু তখন সে প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ীর হিড়িকে পড়িয়া সন্ন্যাসী শশীশেখর এখন শশী বাবু হইয়া বসিলেন। গলা হইতে যূথিকার মালাগাছটা শশী বাবু খুলিয়া ফেলিতেছিলেন, আশু বাবু ও রসিকভায়া যেন মার মার করিয়া উঠিলেন। মালা ফেলা হইল না। মালা দুলিল—

মালা না দুলালে আপনি দোলে!

আশু বাবু মৃদুমন্দ হাস্যে বলিলেন, "ভায়া! অন্তঃপুরিকা-

গণের অনুরোধে পড়িয়া কালিন্দীর পায়ে প্রতিপ্রণামটী তোমায় করিতে হইয়াছিল কি?" রসিকভায়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না হইয়া থাকে ত অন্যায়। আমি ব্রাহ্মণীর কাছে কি বলিয়া মুখ দেখাইব? তিনি যখন কাণ ধরিয়া কৈফিয়ৎ চাহিবেন যে, তোমরা যে পাঁচজনে শালিসি করিয়া ভালবাসার মামলা মিটাইয়া দিলে, তাহার বিচার কি এমনি হইল? যে অপরাধী সে প্রণাম না করিয়া, তাহার পায়ে নিরপরাধিনীকেই আবার প্রণাম করিতে হইল? এ প্রণামের অর্থ কি?"

ব্রজরাজ ধরিলেন, "প্রণামের অর্থ কি একটা হয় না! অর্থ এমনও হইতে পারে যে 'স্বামিন্! তোমার পায়ে প্রণাম! সন্ন্যাসিন্! তোমার পায়ে প্রণাম!! পুরুষ! তোমার পায়ে অবলাজাতির সহস্র প্রণাম!!!"

গিরিশভায়া বিরক্ত হইয়া তখন বলিলেন, "প্রণামের অর্থবিচার তোমরা রাখ, আমি আর না গাইলে হাঁপাইয়া মরিব। আমার গানের কোন অর্থ থাকে, তোমরা এই অর্থে প্রয়োগ করিতে পার।" এই বলিয়া গায়ক তানপূরা ধরিয়া তান ছাড়িলেন। সেই জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর সৌন্দর্য্যে, খাম্বাজ-রাগিণীর মধুর মূর্চ্ছনা, অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া চারিদিকে অমৃতবিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিল; আশুবাবুর মিঠা হাতে মধ্যমানের ঠেকা চলিল। গিরিশ গাইলেন—

দেখো ভুলো না এ দাসীরে।
এই অনুরাগ যেন থাকে চিরদিন তরে॥

তুমি বিনা অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি ও বদন তিলেক না হেরিলে পরে।
কুলমান লাজভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জনমের মত মনঃপ্রাণ তব করে॥

গান শুনিয়া আমি বলিলাম, "প্রেমিকের পায়ে প্রেয়সীর প্রণামের অর্ঘ, ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছু আছে কি?"

সে রাত্রি আমরা মহাসমারোহে যাপন করিয়া, পরদিন বধূসহচারী শশীশেখরকে স্বগৃহে রাখিয়া, সকলে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে, শশীবাবুর ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া একবার গিয়াছিলাম নিমন্ত্রণ, শশীবাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে। গিয়া দেখিলাম মহোৎসব ব্যাপার। শশী বাবুর যশে দেশ সমুজ্জল। নক্ষত্রপ্রতিম পুত্ররত্নকে কোলে লইয়া শশী বাবু স্বজনবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। শিশুর হাসিতে সংসার আলোকময় হইয়াছে। আমি আনন্দগদ্গদচিত্তে জিজ্ঞাসিলাম, "শশী বাবু! কেমন ভাই! ভালবাসার শিক্ষা সংসারে সার্থক হইতেছে কি?" রসিকরঞ্জন বলিলেন, "সন্ন্যাসের পথটা এখন নিকটে আসিল, না পিছাইয়া পড়িয়াছে?" শশী বাবু ঈষদ্ হাসিলেন। ক্রোড়স্থ নবকুমারের নবনীতমুখে সে হাসি প্রতিফলিত হইল। শিশু হাসিভরামুখে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া চঞ্চলকরে তাঁহার অঙ্গ জড়াইয়া ধরিল। গিরিশভায়া সেই সময় গান ধরিলেন। ললিতরাগিণীর ললিতলহরী গগনবিদারী কলকণ্ঠে গগনবিহারে জুটিল।—

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণরজ্জুরূপিণী।
না সবে নিঃশ্বাসপাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥
চমকিত কি কুহক, ত্রিজিত এ তিন লোক,
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমো রজোতে ব্যাপিনী।
বৈষ্ণবী মাযাতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।
দিযা সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতিরোধ,
এবার জনমের শোধ, মা বলে ডাকি জননি ॥

সমাপ্ত।